জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : সমাজ ও রাজনীতি

সুরভী দাস

Dhaka University Library
400826
400826

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
জুন ২০০২

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সুরভী দাস কর্তৃক উপস্থাপিত 'জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : সমাজ ও রাজনীতি', শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

২৬.০৬.২০০২
(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০
বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রসঙ্গকথা ৪

অবতরণিকা ৫

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিত ৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ জহির রায়হানের জীবনবোধ ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

জহির রায়হানের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি ৪১

তৃতীয় অধ্যায়

জহির রায়হানের ছোটগল্প : সমাজ ও রাজনীতি ৭৩

উপসংহার ১১২

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি ১১৫

প্রসঙ্গকথা

'জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : সমাজ ও রাজনীতি ' আমার এম. ফিল. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক (বর্তমানে প্রফেসর) ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ এর তত্ত্বাবধানে ১৯৯৬-১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষে আমি এম.ফিল. কোর্সে নিবন্ধন লাভ করি এবং বাংলা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেন ও প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক-এর কাছে এম.ফিল. প্রথম পর্বের কোর্সসমূহ অধ্যয়ন করি।

অভিসন্দর্ভ রচনার প্রতিটি স্তরে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর নিরন্তর তাগিদ, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সস্নেহ উপদেশনা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে তাঁর অনাবিল আন্তরিকতা, সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রাজ্ঞ নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মকে করেছে সহজসাধ্য। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও মূল্যবান অভিমত দিয়ে শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর আনিসুজ্জামান আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সময় বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি প্রথিতযশা সাংবাদিক, লেখক শাহরিয়ার কবির- এর কাছ থেকে। অগ্রজ জহির রায়হান সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে তিনি সহজতর করেছেন। তাঁর সস্নেহ সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। বিশিষ্ট সাহিত্যিক রাবেয়া খাতুনও জহির রায়হান সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ-সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

অবতরণিকা

'জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : সমাজ ও রাজনীতি' শিরোনামাঙ্কিত বর্তমান অভিসন্দর্ভে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে জীবনঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী জহির রায়হানের উপন্যাস ও ছোটগল্পসমূহ আলোচিত হয়েছে। সর্বমোট তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে পরিকল্পিত হয়েছে এ-অভিসন্দর্ভের অবয়ব। এ-ছাড়াও রয়েছে *'অবতরণিকা'* ও *'উপসংহার'* অংশ। প্রথম অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে -- (ক) দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিত এবং (খ) জহির রায়হানের জীবনবোধ। প্রথম পরিচ্ছেদে ১৯০১-১৯৭১ কালপরিসরে সংঘটিত তৎকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ-পরিচ্ছেদটি রচিত হয়েছে জহির রায়হানের জীবনবোধ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে জহির রায়হানের জীবনবোধ আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে জহির রায়হানের সমাজ ও রাজনীতি চেতনার আলোকে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জহির রায়হানের ছয়টি উপন্যাস এবং তৃতীয় অধ্যায়ে মোট উনিশটি গল্প আলোচিত হয়েছে। জহির রায়হানের উপন্যাস এবং ছোটগল্পসমূহ আলোচনার সময় সমকালীন প্রেক্ষাপট, সাহিত্যিক উৎকর্ষ এবং লেখকের মৌল জীবনার্থ সন্ধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবেশ জহির-মানসে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং সৃজয়িতার কথাসাহিত্যে তার কতটুকু প্রভাব লক্ষিত হয়েছে সেটি ছিল আমাদের গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। অভিসন্দর্ভের 'উপসংহার' অংশে লিপিবদ্ধ হয়েছে সমগ্র আলোচনার সারাৎসার।

বিষয়কে অনিবার্য রূপাঙ্গিকে উপস্থাপন করার মাঝেই যেহেতু উপন্যাস ও ছোটগল্পের শৈল্পিক সার্থকতা নিহিত সেহেতু বর্তমান অভিসন্দর্ভে জহির রায়হানের কথাসাহিত্য অবলম্বনে সমাজ ও রাজনীতিচেতনা বিশ্লেষণের পাশাপাশি সংক্ষিপ্তাকারে শিল্পরূপও আলোচিত হয়েছে। শিল্পরূপ আলোচনার সময় আমরা প্রধানত ভাষা এবং বর্ণনারীতির দিকে দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করেছি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে জহির রায়হানের উপন্যাস এবং ছোটগল্পসমূহের মূলপাঠ গৃহীত হয়েছে যেসব গ্রন্থ থেকে সংস্করণসহ তার তালিকা দেওয়া হয়েছে 'পরিশিষ্ট' অংশের 'গ্রন্থপঞ্জি'র 'মূলগ্রন্থ' উপশিরোনামায়। উদ্ধৃতি ব্যবহারের সময় লেখকের মূল বানানরীতি অক্ষুণ্ন রেখেছি।

প্রথম অধ্যায়

দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিত
ও
জহির রায়হানের জীবনবোধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের জীবনস্পর্শী এবং প্রতিবাদী সাহিত্যধারায় জহির রায়হান (১৯৩৪-১৯৭২) একটি উজ্জ্বল নাম। সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক, রাজনৈতিক কর্মী, চিত্র-পরিচালক ইত্যাদি পরিচয়ে জহির রায়হান পরিচিত। জহির রায়হানের পরিচয় শুধুমাত্র তাঁর নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বাংলাদেশে তিনি যুগপৎ সংগ্রামী চেতনা এবং আদর্শেরও প্রতীক। 'জহির রায়হান' নামের ইতিহাসেই লুকিয়ে আছে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে চলচ্চিত্র তাঁর প্রতিভার উত্তরকালীন স্বাক্ষর ও প্রধান আশ্রয়স্থল হলেও, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল একজন কথাসাহিত্যিক হিসেবেই। স্বকাল এবং সামসময়িক সমাজধারাকে আত্মস্থ করেই বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তাঁর দীপ্ত আবির্ভাব।

জন্মসূত্রেই প্রতিটি মানুষ একটি নির্দিষ্ট কালের জাতিক-রাষ্ট্রিক-ভাষিক - সামাজিক - সাংস্কৃতিক - ঐতিহ্যিক - নৃতাত্ত্বিক -শ্রেণীগত এবং পারিবারিক উত্তরাধিকার বহন করে, যা তার ব্যক্তিচরিত্র এবং ব্যক্তিচৈতন্য নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসব বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে নিরূপিত হয় একজন ব্যক্তির মানসগঠন, গড়ে ওঠে তার স্বতন্ত্র জীবনদর্শন। সমাজচৈতন্য এবং সমাজসত্তার বৈশিষ্ট্য আবার প্রতিফলিত হয় ব্যক্তিগত জীবনদর্শনে।[১] একজন সাধারণ মানুষ জীবন ও জগৎকে যে দৃষ্টিতে অবলোকন করেন একজন শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি তা থেকে স্বতন্ত্র। একজন শিল্পীর শিল্পগৌরবের মানদণ্ড নিরূপিত হয় ব্যক্তি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্কের চারিত্র্য নির্ধারণের উপর। 'মানুষ যেহেতু স্বয়ম্ভু ও নিরবলম্ব নয় একটি বিশেষ স্থান-কাল-দেশ এবং সুনির্দিষ্ট সামাজিক রাজনৈতিক পরিচয় গৌরবে সংযুক্ত, সেহেতু সমাজচৈতন্যের পরিপ্রেক্ষণীতেই একজন ব্যক্তির উদ্ভব ও বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ অধিকতর প্রাসঙ্গিক।'[২] একজন কথাসাহিত্যিক যেহেতু সমাজের সতর্কদ্রষ্টা ও জীবনঘনিষ্ঠ রূপশিল্পী; তাই সামসময়িক সমাজ ও সময়ের সঙ্গে তাঁর সংলগ্নতা অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ।[৩] জীবনঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী জহির রায়হানের সাহিত্যে স্থান পেয়েছে মানুষ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজ, সামসময়িক দ্বান্দ্বিক সামাজিক প্রতিবেশ এবং সমকালীন রাজনীতি, সর্বোপরি বৈশ্বিক মানবিকতাবোধ। কথাসাহিত্যিক জহির রায়হানের শিল্পগৌরব মূল্যায়নে তাঁর সমকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানা বাঞ্ছনীয়। যদিও তিনি জন্মেছিলেন বিশ

শতকের তিরিশের দশকে তথাপি এই শতকের সূচনাকাল থেকে সংঘটিত সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলী জহির রায়হানের জীবনবোধ ও মানসগঠনে কার্যকর অবদান রেখেছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। এই বিষয়ের নিরিখে দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে আমরা জহির রায়হানের জীবনবোধ আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

বর্তমান গবেষণার বিষয় নিরিখে বিস্তৃত বর্ণনার পরিবর্তে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে আমরা জহির রায়হানের দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে আলোচনা করেছি। এজন্য সময়কাল হিসেবে গ্রহণ করেছি ১৯০১ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়কালের মধ্যে সংঘটিত বাঙালির সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীই হবে আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঘটনাবলী হিসাবে সেই সব বিষয়ই উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাঙালি এবং বাংলাদেশ সম্পৃক্ত।

ইংরেজ শাসনামলে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাবচেতনার আলোকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অভ্যুদয় হল তা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নববিকশিত এই মধ্যবিত্ত সমাজের উত্থান হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৮) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দ্বারা যেমন ত্বরান্বিত হয়েছিল, তেমনি যুগপুরুষরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে আর্থিক অসঙ্গতি, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ, রক্ষণশীল মনোভাব ইত্যাদি কারণে মুসলমান সম্প্রদায় সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। এর কারণ ইংরেজ কর্তৃক বাংলার পরিবর্তিত শাসনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত ছিল। ইংরেজ শাসনামলে বাংলার গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজে ভাঙন ধরে, জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে নগরমুখী। অর্থনৈতিক জীবনের মূল মাপকাঠি জমি থেকে মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়।[৪] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি এবং নগদ অর্থ সঞ্চিত না থাকায় বাংলাদেশের ভূমি নির্ভর উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে আর্থিক সঙ্গতির কারণে হিন্দু সমাজ নিজেদের পুনর্গঠনের সুযোগ পেয়েছিল এবং এরাই উপহার দিয়েছিল বাংলার নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফসল। ১৮৭০- এর দিকে এসে বিভিন্ন ইতিবাচক কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে, যা তাদের মধ্যে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বোধ জাগ্রত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজ বিকশিত হতে সময় লেগেছিল প্রায় একশ বছর। বিশ শতকের সূচনাকাল থেকে সংঘটিত নানা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনা-পরম্পরা ক্রমশ বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রাকে সচেতন ও

আলোড়িত করে তুলেছিল। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬), মর্লিমিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯), বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৭), লক্ষ্মৌ প্যাক্ট (১৯১৬), রুশ বিপ্লব (১৯১৭), জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯) খিলাফত আন্দোলন (১৯২০), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯২১), বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে যুগপুরুষ নজরুল ইসলামের আবির্ভাব (অগ্নিবীনা-১৯২২), মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা (১৯২৬), প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠা (১৯৩৯), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), ১৯৪৩- এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০), ১৯৪১-৪৬ কালপরিসরে সংঘটিত অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ-ইত্যাদি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তা অতিক্রম করেছে এক ক্রান্তিকাল। এসব ঘটনাবলীর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মুসলিম সাহিত্য সমাজ গঠন, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৪০ এর ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে ভিত্তি করে বাংলাদেশের মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ জেগে উঠতে চেয়েছিল। "উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের জোতদার, তালুকদার, ও হিন্দু জমিদারদের মদদপুষ্ট বড় তালুকদারদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিম উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।"[৫] এই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য থেকেই আবির্ভাব ঘটেছিল হিন্দু মুসলমানের মিলনকামী নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২)। আক্ষরিক অর্থেই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের অধিকারী ফজলুল হকের আবির্ভাব বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। বাংলাদেশের বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং নিপীড়িত কৃষক জনগণের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব এ.কে. ফজলুল হক বাঙালি মুসলমান এবং কৃষক সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন (১৯৩৮), প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৩৯) এবং মহাজনী আইনের (১৯৪০) মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০-১৯৪১ কাল-পরিসরে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ ছিল বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।[৬]

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রগতিশীল চেতনাস্পর্শী এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্জিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নব্যশিক্ষিত তরুণমানসে প্রচলিত প্রথা ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। সেই সাথে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে; সর্বস্তরের বাঙালি জনমনে ছড়িয়ে দিয়েছে স্বাধিকার ও জাতীয়তাবোধের চেতনা।

প্রারম্ভিক যাত্রালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রানুগ শক্তিতে পরিণত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে সদ্য উত্তীর্ণ শিক্ষিত শ্রেণীর সমন্বয়ে ক্রমবিকশিত হতে থাকে ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী।[৭] বলাবাহুল্য এই

নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল মুসলিম সম্প্রদায় কেন্দ্রিক। "সামন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী য়ুরোপীয় বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদ-মানবতাবাদকে অঙ্গীকারকল্পে ১৯২৬ এ প্রতিষ্ঠা করেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ, এবং প্রকাশ করে মুখপত্র 'শিখা'।"[৮] শিখা'র মুখবন্ধরূপে ছাপানো হত- 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখান অসম্ভব।' ধর্মান্ধ এবং আধুনিক চিন্তাচেতনাবর্জিত বাঙালি মুসলমান সমাজকে শিক্ষা ও মুক্ত বুদ্ধিচর্চার দ্বারা নবজাগরণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৈয়দ আবুল কাদির, কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল ফজল, আনোয়ারুল কাদির, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, শামসুল হুদা, মোখতার আহমদ সিদ্দিকী প্রমুখ মনীষী সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যাকে তাঁরা অভিহিত করেছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন অভিধায়। "মুসলিম সাহিত্য সমাজ যে নবজাগরণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ কর্মে ও সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন তার ভিত্তিমূলে ছিল : ১) মুস্তফা কামালের উদ্যম, ২) বাংলার বা ভারতের নবজাগরণ, ৩) মানুষের সর্বকালের উদার জাগরণ প্রয়াস।"[৯] আর যাঁদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি থেকে মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখকগণ প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন ১) মুস্তফা কামাল, ২) রামমোহন, ডিরোজিও, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও নজরুল ৩) হযরত মোহাম্মদ (সঃ), শেখ সাদী, গ্যেটে ও রোমাঁরোলা।

১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবও বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রগতিশীল জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণমানস ক্রমশ সক্রিয় ও আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল মার্কসবাদ এবং কম্যুনিজমে। "মার্কসবাদে বিশ্বাসী অথচ বুর্জোয়া মানবতাবাদে আস্থাশীল"[১০] লেখক শিল্পীদের সমন্বয়ে গঠিত "প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ চল্লিশের দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের দ্বন্দ্বময় ও রক্তাক্ত পটভূমিতে"[১১] বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণমানসকে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় সচেতন করে তুলতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে (১৯৩৯-১৯৪৫) বাংলাদেশের সার্বিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তন একদিকে ছিল সমাজকেন্দ্রিক, অন্যদিকে রাজনীতিকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষের প্রথাগত সমাজজীবনকে যেমন বিপর্যস্ত করেছে, তেমনি মানুষ হারিয়েছে তার প্রাক্তন বিশ্বাস, প্রচলিত মূল্যবোধ, সনাতন সংস্কার ধ্যানধারণা। ফলস্বরূপ বৃটিশ রাজশক্তির উপর আস্থা হারায় সাধারণ মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়পর্বেই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত হয় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব, যা বাংলাদেশের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক প্রবলভাবে সমর্থিত হয়। ১৯৪৩- এর মন্বন্তর সচেতন জনমানসে যে রাজনীতি চেতনার জন্ম দেয়, তার মূলে ছিল পরাধীনতার গ্লানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দু'বছর পর ১৯৪৭- এ বিভক্ত হয় ভারতবর্ষ। সৃষ্টি হল- ভারত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান। ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ যুক্ত হল পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসাবে। "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, 'প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ'- প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে তিন দশকব্যাপী বাংলাদেশে যে নব্য

শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও বুর্জোয়া মানবতাবাদী মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়, তা একটি সংঘবদ্ধ শ্রেণীচরিত্রের রূপ নেবার পূর্বেই কার্যকর হয় ভারত বিভাগ।"[১২] জাতিক, নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক অথবা ভাষা কোনদিক দিয়েই বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সাযুজ্য ছিলনা। যে কারণে দ্বন্দ্ব সংঘাত অনিবার্য।'৪৭- পরবর্তী ইতিহাস তারই দীর্ণ, রক্তাক্ত স্বাক্ষর।

দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগ ছিল বৃটিশ 'সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রেরই বিষবৃক্ষ।'[১৩] প্রকৃতপক্ষে "সেই মধ্যরাত্রির স্বাধীনতা ছিল খণ্ডিত, অশ্রুসিক্ত ও শোনিতলিপ্ত। সে স্বাধীনতা ছিল একই সঙ্গে আমাদের Triumph ও Tragedy।"[১৪] ভৌগোলিক – নৃতাত্ত্বিক -সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্যের পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক থেকেও পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান ছিল দুই মেরুতে দণ্ডায়মান। খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, ভাষা, সংস্কার, সচেতনতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল 'পুরোপুরি মধ্যযুগীয় আধা সামন্ততান্ত্রিক।' পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃটিশ রাজশক্তি কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মাধ্যমে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করে আসছিল। যে কারণে ভূমি ব্যবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা পূর্ব পাকিস্তান সর্বদাই এগিয়ে ছিল। দেশবিভাগ কালে বর্ধিষ্ণু কৃষিপ্রধান অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রধান উৎস ছিল পাট শিল্প। সেসময় পূর্ব-পাকিস্তানই ছিল পৃথিবীর একমাত্র পাট রপ্তানীকারক দেশ। ধান ও চা ছিল অন্যান্য প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল পশুচারণ ও পশুপালনের উপর। অর্থনীতি ও উৎপাদিত পণ্যের এই বৈষম্য শুরু থেকেই দুই পাকিস্তানে বিদ্যমান ছিল।[১৫] বলাবাহুল্য পাকিস্তান জন্মের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ভিত্তি করে লাভবান হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান, আর ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল পূর্ববাংলার জনগণ।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভিত্তি করে ঢাকাকেন্দ্রিক যে প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকশিত হচ্ছিল তারা ছিল 'মুক্ত চেতনার অনুসারী, মানবতাবাদী, গণতন্ত্র ও মার্কসীয় চেতনাপুষ্ট।' এর পাশাপাশি সামন্ত মূল্যমানে বিশ্বাসী আরেক দল মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল, যারা ধর্মীয় ঐক্যের মানদণ্ডে এবং শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছিল। এদেরই সহায়তায় অল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানী বৃহৎ বেনিয়া পুঁজি পূর্ব-বাংলার অর্থনীতি, রাষ্ট্রক্ষমতা ও উৎপাদনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে সক্ষম হয়। দেশীয় এই সামন্তশ্রেণীর সহায়তায় এবং পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের শোষণে পূর্ববাংলায় গড়ে উঠল আধা ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা, পুনর্জাগরণ হল সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের। শুরু হল পাকিস্তানী শাসকবর্গ কর্তৃক জাতিশোষণ, শ্রেণীশোষণ ও সাংস্কৃতিক অবরোধ। প্রতিরোধস্বরূপ প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী ১৯৪৮- এ প্রতিবাদ জানাল। প্রতিবাদের সে ভাষা হয়তো তেমন শক্তিশালী ছিলনা কিন্তু তার মাঝেই যে সুপ্ত

ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বীজ, পরবর্তী ইতিহাস তারই প্রামাণ্য আলেখ্য।[১৬]

পাকিস্তানী শাসন ও শোষণ বাংলাদেশের মৃত্তিকা সংলগ্ন জীবনযাত্রাকে ক্রমশ দুর্বিষহ করে তোলে। বাঙালি জাতিসত্তাকে বন্দী করা হয় পরাধীনতার শৃঙ্খলে। ১৯৪৭- এর দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশে যে খাদ্যসংকট দেখা দেয় ১৯৪৯সালের শেষদিকে এসে তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে পুনরায় দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করে ১৯৫১-এ। পাশাপশি বন্যা, মহামারী, খাজনা, পাকিস্তান সরকারের ভ্রান্ত খাদ্যনীতি, বস্ত্র, কেরোসিন, ভোজ্যতেল ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি ও দুস্প্রাপ্তি বাঙালির সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। প্রতিবাদস্বরূপ বাংলাদেশের কৃষক জনতা কর্তৃক সংঘটিত হয় একাধিক বিদ্রোহ। এর মধ্যে সিলেটে জমিদারী ও নানকার প্রথাবিরোধী আন্দোলন (১৯৪৮-৫০), ময়মনসিংহ জেলায় জমিদারী ও টঙ্ক প্রথাবিরোধী আন্দোলন (১৯৪৯-৫০), নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ (১৯৫০) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আন্দোলন ঠেকাতে চলে পাকিস্তানী শোষণযন্ত্রের মধ্যযুগীয় বর্বর দমননীতি। কিন্তু 'সুসংগঠিত জাতীয় নেতৃত্বের অনুপস্থিতি'তে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত এসব মহান আন্দোলন সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারেনি।[১৭]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশের প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাকিস্তানী সরকারের শোষণমূলক চারিত্র্য অনুধাবনে সক্ষম হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রশ্নে ১৯৪৮- এর প্রতিবাদ ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ। ১৯৪৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ইসলামী চিন্তা-চেতনাপুষ্ট একদল যুবক 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। বামপন্থী বুর্জোয়া মনোভাবের অধিকারী না হয়েও জন্মলগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ এর প্রতিটি আন্দোলনে বাঙালিদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরাই ছিল রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষার দাবীর উদ্যোক্তা। ১৯৪৮- এর মার্চে ভাষা আন্দোলন যখন সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে তখনো তাদের সমর্থন অব্যাহত ছিল।[১৮] ১৯৪৮- এর ফেব্রুয়ারীতে যে সংগ্রামের সূত্রপাত মার্চে এসে তা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১১ মার্চ প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ১২ তারিখে এই বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে এবং ১৪ তারিখে তা প্রদেশব্যাপী দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় রাস্তায় বেরোল ছাত্রদের মিছিল। পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হল শত শত ছাত্র।[১৯] বিক্ষোভ চলাকালে ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদস্বরূপ ১৭ মার্চ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়।[২০] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজ ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। এসময় ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবীতে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' (১৯৪৮)। বস্তুত ১৯৫২ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ছাত্র সংগঠন তাদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল এবং '৫২- এর ভাষা আন্দোলনের পুরোধাভাগেও ছিলেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা।[২১] উল্লেখযোগ্য যে 'তমদ্দুন মজলিশে'র উদ্যোগেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম

পরিষদ গঠিত হয় এবং গণপরিষদে সর্বপ্রথম বাংলাভাষার দাবী উথাপন করেন পূর্ববাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮)। ১৯৪৮-এ ক্রমাগত ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতায় পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছাত্রসমাজের সঙ্গে আপোষ রফায় যেতে রাজী হলেন। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে- ভাষা আন্দোলন দুটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। প্রথম পর্যায় ১৯৪৮- এর ফেব্রুয়ারী মার্চ, দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৫২- এর জানুয়ারী- মার্চ।

১৯৪৮- এ সংঘটিত ভাষা আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজকে অতিক্রম করে বৃহত্তর জনজীবনকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছিল। কেননা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে শুধু রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীই জড়িত ছিলনা, এর সঙ্গে জড়িত ছিল আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্নও। এসময় ভাষা আন্দোলনের সাময়িক সাফল্যের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক- সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয় এবং জনশক্তি ক্রমশ সচেতন হয়ে ওঠে। [২২]

জাতীয় সংকটের এই ক্রান্তিলগ্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯৩-১৯৬৩) বাঙালির রাজনৈতিক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। উদারনৈতিক ও গণতন্ত্রীমনা সোহরাওয়ার্দী মানুষের বাক্-স্বাধীনতা এবং সংঘ জীবনচেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করেন, যা শেষপর্যন্ত 'আওয়ামী লীগ' নামে পরিচিত হয়। শিল্পপতি, ভূস্বামী, পুঁজিপতি এবং ক্ষমতাসীন সরকার সমর্থিত মুসলিম লীগের বিপরীতে আওয়ামী লীগের প্রধান সমর্থক ছিল বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। কালক্রমে এই বৈপরীত্য পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্বের আকার ধারণ করে। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার বিরোধী দল আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড রুখতে নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। মিথ্যা মামলা ও বিনা বিচারে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে কারারুদ্ধ করে রাখে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের। ফলস্বরূপ আওয়ামী লীগ অচিরেই একটি সংঘবদ্ধ প্রতিবাদকারী দলে পরিণত হল।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেশবিভাগ-পূর্ব 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'কে আশ্রয় করে ঢাকাকেন্দ্রিক একটি প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকশিত হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিলুপ্ত হয়ে যায়। রবীন্দ্র-বিরোধিতা, কম্যুনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের তীব্র দমননীতি এবং প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের দ্বিধাবিভক্তি এই বিলুপ্তির কারণ হিসেবে কাজ করেছে। 'পরিবর্তিত জাতীয় পরিস্থিতিতে' সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ শিল্পী সাহিত্যিকরা ১৯৫১ সালে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' প্রতিষ্ঠা করেন।[২৩] পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে নব-উদ্দীপনা ও গতিবেগ সঞ্চারে সমর্থ হয়।[২৪]

১৯৪৮ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িক

শোষকবর্গ তা নস্যাৎ করতে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কার্যত তারা তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিল, বাঙালি জনমানসে যা তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। এই ক্ষোভ আরও তীব্রতর হয় যখন ১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার এক জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করলেন- "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।" তার এই হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রচণ্ড আঘাতের মত এল গণমানসে। কেননা ১৯৪৮ সালে তিনিই বিশেষভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত প্রদানের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।[২৫] বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে ফেটে পড়ল বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। সক্রিয় আন্দোলনের লক্ষ্যে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' (৩০ জানুয়ারী ১৯৫২) তাদের ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ এর জনসভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ২১ ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। ছাত্র আন্দোলন ঠেকাতে পাকিস্তান সরকার ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে ঢাকা জেলার সর্বত্র একমাসের জন্য সকল প্রকার ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা জারী করে।[২৬] এদিকে নেতাদের দ্বিধান্বিত মনোভাবের বিপরীতে ছাত্রসমাজ এবং যুবলীগ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে।[২৭] ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী বাঙালির জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক দিন। রাস্তায় রাস্তায় ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বেরিয়ে এল, শ্লোগানে-শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল ঢাকার রাজপথ, বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল এসে সমবেত হতে লাগল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তেজনাময় হয়ে উঠলে ছাত্রদের ঠেকাতে পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস এবং পরে গুলিবর্ষণ করতে লাগল। নিহত হলেন চারজন ভাষা সৈনিক- রফিক, বরকত, সালাম, জব্বার ; আহত হল অনেক, গ্রেপ্তার হল কয়েকশত। পাকিস্তানী সরকারের এই বর্বর দমননীতির মুখে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। ২২-২৩ তারিখেও আন্দোলন ও গোলাগুলি চলে।[২৮]

২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ অমর শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের উদ্যোগে রাতারাতি নির্মিত হয় ভাষা সৈনিকদের স্মরণে শহীদ মিনার। ২৪ তারিখ সকাল থেকেই নির্মিত শহীদ মিনারটি পরিণত হয় বাঙালির পবিত্র তীর্থপীঠে। দলে দলে সকল শ্রেণী, বয়স, পেশার নর-নারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসে পবিত্র এই তীর্থপীঠে। গণজোয়ারে ভীত সন্ত্রস্ত পাকিস্তান সরকার ২৬ তারিখ অপরাহ্নে বাঙালির পবিত্র তীর্থভূমি শহীদ মিনারটি ধ্বংস করে দেয়। পরবর্তী দশবছরের প্রথম তিন বছর শহীদের রক্তঝড়া কালো কাপড় ঘেরা স্থানটুকুই হয়ে উঠল বাঙালির শহীদ মিনার। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদ দিবস পালন শুরু হয়। ১৯৫৫ সালে শহীদ দিবস পালনকালে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী গ্রেপ্তার হয়। এই ঘটনা শহীদ দিবসকে একটি নতুন তাৎপর্য দান করে সংগ্রামী চেতনায় পরিণত করে। পাকিস্তান শাসনামলের পরবর্তী প্রতিটি শহীদ দিবসে সংগ্রামী বাঙালি জাতিসত্তা শপথ নিয়েছে স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। ১৯৬৩ সালে নবগঠিত শহীদ মিনার একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ছিল বাঙালির সকল প্রকার সংগ্রাম ও আন্দোলনের প্রেরণা উৎস।[২৯]

প্রকৃতপক্ষে '১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মুষ্টিমেয় ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন ছিলনা, তা শুধু শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিলনা। বস্তুতপক্ষে তা ছিল পূর্ব বাংলার উপর সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার পাকিস্তানী শাসক-শোষক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়ণের বিরুদ্ধে এক বিরাট ও ব্যাপক গণ-আন্দোলন।[৩০] রক্তদান সত্ত্বেও '৫২-এর সেই প্রতিবাদ প্রত্যক্ষত সার্থক হলনা। কারণ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব দানকারী বাঙালি পুঁজিবাদী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর তখন সবেমাত্র কৈশোরকাল। মুখ্যত '৫২-এর ভাষা আন্দোলন ছিল সাম্প্রদায়িক ও সামন্ততান্ত্রিক পাক-শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও অশক্ত পুঁজিবাদী শ্রেণীর শৃঙ্খলমুক্তির রক্তিম প্রতীক।[৩১] তাই একুশের জন্ম কোন তাৎক্ষণিক আঘাতের ফসল নয়। পূর্ববাংলার অর্থনীতিকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করে আমাদের সামাজিক -রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকার হরণের লক্ষ্যে যে ষড়যন্ত্র চলছিল তারই একটি সুপরিকল্পিত আঘাতস্বরূপ একুশের জন্ম হয়েছিল। 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'- এই কথার তাৎপর্যকে ছাড়িয়ে ভাষা আন্দোলন আমাদের স্বাধিকার আদায় ও স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।[৩২]

সরকার-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে ১৯৫৩ সালে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট, এবং ১৯৫৪ সালে ২১ দফা কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য যে, ২১ দফার জন্ম হয়েছিল ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত ২১ ফেব্রুয়ারীর চেতনাউৎস থেকে। পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলার স্বীকৃতি দান, নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার, সকল রাজবন্দীর কারামুক্তি, শ্রমিক স্বাধীনতা প্রদান ও বাস্তবনীতি অনুসরণ ইত্যাদি দাবী ২১ দফা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৪ -এর সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট আইনসভার ৩০৯টি আসনের মধ্যে ৩০০ আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পক্ষান্তরে, মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পেয়ে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করে।[৩৩] যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করলেও প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের চক্রান্তে ১৯৫৪ সালের মে মাসে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়।[৩৪] 'এই হল পূর্ব পাকিস্তানে সামন্ত প্রথাভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর পুঁজিবাদের প্রথম আঘাত। কিন্তু মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলেও ১৯৫৯ এর পূর্বে পুঁজিবাদ এখানে জয়যুক্ত হতে পারেনি। ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থান সামন্ত প্রথাভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর শেষ এবং চরম আঘাত।'[৩৫]

১৯৪৭- এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাষা আন্দোলন, বাঙালির প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৪৭-৫৭ কালিক পরিসরে সংঘটিত প্রধান ঘটনাবলী সচেতন বাঙালি জনমানসে যেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তেমনি স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধেও উজ্জীবিত করেছে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা প্রশ্নে। গণতন্ত্র, মানববাদ ও প্রগতিশীল চেতনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বনির্ভর প্রত্যাশায় মধ্যবিত্ত মানসের অগ্রগতি সুস্পষ্ট। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সচেতনতা মধ্যবিত্তের গণ্ডীকে অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজ জীবনেও যে প্রতিফলিত হয়েছিল, ১৯৫৪-এর সাধারণ নির্বাচন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

বাঙালির জাতীয় জীবনে কালো অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে। পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বাঙালির প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক চেতনাকে অবরুদ্ধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বাঙালি জাতিসত্তাকে অবদমনে সামরিক শাসকচক্র সর্বক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। 'সামরিক আইন জারি করে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ, সমস্ত রাজনৈতিক দল ও কার্যক্রম বাতিল করা হয়। সকল মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা হয় এবং সভা ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। অনেক রাজনৈতিক নেতাকে কারারুদ্ধ এবং এবডো (Elective Bodies Disqualification Ordinance 1959) আইনের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০ নেতা ও কর্মীকে রাজনীতি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হয়।'[৩৬]

বাঙালির প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনে আইউব-প্রশাসন ২৭টি কমিশন গঠন করে। পাকিস্তানী শাসকচক্র বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বরাবর হিন্দুদের ভাষা ও সংস্কৃতি বলে ঘৃণা করেছে। যে কারণে তারা ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আলোকে বাংলা সংস্কৃতির রূপান্তর করতে চাইলেন। এ প্রয়াসেই ১৯৫৯ সালের ৩১ জানুয়ারী 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' বা 'Pakistan writer's Guild' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নানামুখী সুযোগ সুবিধা বিশেষত অর্থনৈতিক প্রলোভনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার অনেক প্রগতিশীল লেখক শিল্পীকে তারা এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য করতে সমর্থ হয়। বস্তুত পাকিস্তানী শাসনামলে অনেক শিল্পী সাহিত্যিকই আত্মানুসন্ধান ও সত্ত্বানুসন্ধানে পলায়নমুখর ও বিবরকামী হয়ে পড়ে। নিশ্চিত জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে অনেকেই তাই আপোষকামী হয়ে 'পাকিস্তান লেখক সংঘে' যোগদান করেন। পরবর্তীতে অবশ্য এই 'লেখক সংঘ' বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী লেখক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

বাঙালির সংগ্রামশীল চেতনাস্রোত অবরুদ্ধ করার প্রয়াসে সামরিক শাসন সাময়িক সফল হলেও ক্রমশ বাঙালি জাতিসত্তা দ্রোহ ও বিক্ষোভে ফুসে উঠতে থাকে। এসময় ছাত্র রাজনীতি একটি নতুন মাত্রা লাভ করে। জাতির মৌলিক অধিকার ও জাতীয় চেতনার পুনরুজ্জীবনে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রূপান্তরিত হয় শহীদ দিবস (১৯৬১) উদ্‌যাপনকে উপলক্ষ করে। ব্যাপকতা লাভ করে জননেতা সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারকে (৩০ জানুয়ারী, ১৯৬২) কেন্দ্র করে। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিল ঘোষণা করা হলে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সভা সমাবেশ মিছিল আয়োজিত হয়। পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও যশোরে ১৫৩ জন আহত এবং গোলাম মোস্তফা (বাস কণ্ডাক্টর) ও কিশোর ওয়াজিউল্লাহ (গৃহভৃত্য) নিহত হয়। এই ব্যাপক আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলস্বরূপ নিষ্ক্রিয় প্রায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনীতিতে সংঘবদ্ধ হন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ ছিল এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ৮০ ভাগ যোগানদাতা ছিল পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু অর্থনৈতিক সুফল লাভে পূর্ব পাকিস্তান বরাবর অবহেলিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে পুঁজি করে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিকায়ন হচ্ছিল, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চাৎপদ করে রাখা হচ্ছিল ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে। শিক্ষা ও চাকুরীক্ষেত্রেও বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সৃষ্ট পূর্ব বাংলার সদা-বর্ধিত বেকার সমস্যা, শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগের অভাব, রাজনৈতিক- সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি বাঙালি জাতিসত্তাকে ক্রমশ বিদ্রোহী ও সংগ্রামমুখী করে তুলছিল।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করে একটি তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৩ সালের ২২-২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উদ্‌যাপিত ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহে বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের চেতনাকেও তুলে ধরা হয়। অসীম আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ অনুষ্ঠান উপভোগের পাশাপাশি জাতীয়তাবোধের চেতনালোকে উজ্জীবিত হয়েছে।

৭ জুন, ১৯৬২ সালে দীর্ঘ ৪৪ মাসের আইউবী-সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। সরকার গঠনে আইউব সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অনুসরণের কথা বললেও কার্যত তা ছিল গণতন্ত্রের মৌল আদর্শ ও নীতি বর্জিত। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের নয় জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শাসন ব্যবস্থায় নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু সামরিক স্বৈরতন্ত্রকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দাবী উপেক্ষা করে সরকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নতুন বিধিমালাস্বরূপ ফ্রান্সাইজ কমিশন গঠন করে। পাকিস্তানী শাসকচক্র বাঙালির গণতান্ত্রিক অধিকার হরণে একের পর এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে। এই ষড়যন্ত্রের প্রক্রিয়া হিসেবে মোনায়েম খাঁর শাসনাধীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার বিহারীদের সহায়তায় ১৯৬৩ সালের ৩ জানুয়ারী কাশ্মীর দিবস ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করে। এই দাঙ্গা প্রতিরোধে ঐক্যের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি যে সংঘশক্তির পরিচয় দেয় তাতে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সমর্থ হয়। ১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইউব খান জয়ী হলে রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ ও আন্দোলন সূচিত হয়। আইউব খানের অপসারণের দাবীতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১৪ দফা ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলে। এ সময় পাকিস্তান কর্তৃক সংঘটিত সুপরিকল্পিত পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৫) সরকার বিরোধী আন্দোলনকে চাঙ্গা করে তোলে।

সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩) পর পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সামসময়িক ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচি নিয়ে পুনর্গঠিত হয়ে সক্রিয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনের বেগবান ধারাকে রুদ্ধ করতে চলে পাকিস্তানী সরকারের শোষণ, ষড়যন্ত্র, দমননীতি। আন্দোলনমুখর এই

প্রেক্ষাপটে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে শেখ মুজিবর রহমান লাহোরে All Pakistan National Conference এ তাঁর ঐতিহসাকি ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফাকে কেন্দ্র করেই বাঙালির জাতীয়তাবাদী স্বাধিকার আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। ৬ দফা কর্মসূচির প্রচার ও প্রসারে ভীত হয়ে কুচক্রী পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে কয়েকবার গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করে, যার ঘৃণিত বহিঃপ্রকাশ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। সরকারের বর্বরতা নৃশংসরূপ ধারণ করে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহ্বায়িত প্রদেশব্যাপী হরতাল চলাকালে। সরকারী হিসেবে ঢাকায় ৪ জন এবং নারায়ণগঞ্জে ৬ জন নিহত হয়, আহত হয় ১৩ জন। বন্ধ করে দেয়া হয় আওয়ামী লীগের মুখপত্র 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকা। প্রকৃতপক্ষে সামরিক শাসক আইউব সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিনাশ সাধন। এজন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন শোষণ-নির্যাতনের পথ। কিন্তু পরিণত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও জনসমাজ প্রতি-আক্রমণ করেছে সংঘবদ্ধভাবে। বাঙালির এই সংঘবদ্ধতাই ছয় দফাকে ভিত্তি করে সর্বব্যাপ্ত গণআন্দোলনের রূপলাভ করে।

১৯৬৮ সালে শাসকচক্র আরেকবার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাংলা বানান, বর্ণমালা ও ভাষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি উপসঙ্ঘ গঠন করে। উপসঙ্গের সুপারিশ মালা গৃহীত (১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮) হবার সঙ্গে সঙ্গে ত্বরিত বিরোধিতা করেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই ও মুনীর চৌধুরী। প্রতিরোধস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ শহরব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিরাট প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭- এর দেশবিভাগের পর থেকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছিল। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে ছাত্রসমাজ এগার দফা ভিত্তিক আন্দোলনের প্রগতিশীল রূপরেখা জনসমক্ষে উপস্থাপন করে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বাক্-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কারুরুদ্ধ সকল ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক- রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি দান, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি তাদের দাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা ও এগার দফাকে ভিত্তি করে সংগ্রামমুখী বাঙালি জাতিসত্তা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়।

১৭ জানুয়ারী, ১৯৬৯-এ ছাত্রসমাজ কর্তৃক এগার দফার ভিত্তিতে দাবী দিবস পালনকালে ছাত্ররা পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়। ১৮ জানুয়ারীতেও ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ২০ জানুয়ারী তা চরম আকার ধারণ করে। পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান। প্রতিবাদে ২৪ জানুয়ারী সূচিত হয় ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান। সচিবালয়ে বিক্ষোভকালে পুলিশের গুলিতে নিহয় হয় পাঁচজন। এদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয় ১৫ ফ্রেবুয়ারী, ১৯৬৯। ১৮ তারিখ সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. সামসুদ্দোহা। এখবর ঢাকায় প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য আইন অমান্য

করে রাস্তায় নেমে পড়ে মানুষ। শ্লোগানে ও বুলেটে মুখরিত হয়ে ওঠে সেদিনের রাতের ঢাকা শহর। সরকারী পত্রিকামতে সে রাত্রিতে নিহতের সংখ্যা ছিল ৩৯ জন। সর্বব্যাপী গণ-আন্দোলনের তীব্রতায় ভীত সন্ত্রস্ত পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দান করে। আইউব সরকার ও পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের অপসারণের দাবীতে ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ তারিখে ১১ দফার ভিত্তিতে ঢাকায় স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিস্থিতিতে আইউব খান আইন বহির্ভূতভাবে ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন (২৪ মার্চ, ১৯৬৯)। সামরিক বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই দেশব্যাপী সামরিক আইন জারী করে। ২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) ইয়াহিয়া খান তার ভাষণে 'এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা' এবং অধিক স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ করলেও ছাত্রসমাজ তাদের ১১ দফা ভিত্তিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প থাকে। সমাজচৈতন্যও তাদের সহগামী হয়। শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দও 'প্রেস অর্ডিন্যান্স' বাতিলের দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এই প্রেক্ষাপটে ইয়াহিয়া খান (২৮ মার্চ, ১৯৭০) ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাস্বরূপ আইনগত আদেশের (Legal Framework Order, 1970) ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬২ টি আসন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত করেন।

১২ নভেম্বর, ১৯৭০ পূর্ববাংলার দক্ষিণাঞ্চলে সংঘটিত হয় শতাব্দীর প্রলয়ংকারী জলোচ্ছ্বাস, যাতে প্রাণ হারায় দশ লক্ষ মানুষ। এই ঘটনায় পাকিস্তান সরকার যে অবহেলাপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করে, তাতে পূর্ব বাংলার জনমানস স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনে মীমাংসিত বোধে উপনীত হয়। এই চেতনা প্রবলতর আকার ধারণ করে ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে (৭ ডিসেম্বর) পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করায়। দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি ৮৮টি আসন পেয়ে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও আওয়ামী লীগ সরকার গঠনে দীর্ঘসূত্রীতার শিকার হয়। এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারী ছিল ইয়াহিয়া খান এবং পিপলস্ পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো। ক্ষমতা হস্তান্তরে বিভিন্ন কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়ায় পূর্ববাংলার জনমানস তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে।[৩] এই পরিস্থিতিতে ৭ মার্চ, ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বস্তুত সেই ছিল বাঙালির প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা। এদিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক পিছিয়ে দেয়া হলে পূর্ববাংলা গণ-বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। আওয়ামী লীগ এই গণ-অভ্যুত্থানকে স্বাধীনতা লাভের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করে। প্রদেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতার মুখে ভীত সন্ত্রস্ত পাকিস্তানী বাহিনী ২৫ মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমন্ত বাঙালির ওপর। শুরু হল ইতিহাসের ঘৃণিত, বর্বরতম হত্যাকাণ্ড। তাদের নৃশংসতা, বর্বরতা, পৈশাচিকতা হার মানিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাৎসী বাহিনীকেও। ইতিহাসের এই ঘৃণিত ধ্বংসযজ্ঞ স্তম্ভিত, সচকিত করেছে বিশ্ব বিবেককে। "পাকিস্তানি সামরিক জান্তার কাছে বাঙালির অপরাধ ছিল এই যে, তারা গণতন্ত্র চেয়েছিল, সকল প্রকার শোষণ-পীড়নমুক্ত একটি সমাজ

চেয়েছিল। তারা এমন একটি রাষ্ট্র চেয়েছিল যেখানে ধর্মের নামে হানাহানি থাকবেনা। নিজেদের কয়েক হাজার বছরের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে তারা মাথা উঁচু করে বাস করতে পারবে। বাঙালির এই আকাঙ্ক্ষা ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ পাকিস্তান এমন একটি সমরতান্ত্রিক মৌলবাদী রাষ্ট্র যেখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কোন স্থান নেই।"[৩৮]

২৫ মার্চ, ১৯৭১ বিভীষিকাময় কালো রাত্রির পর শুরু হল স্বাধীনতার জন্য বাঙালির সশস্ত্র সংগ্রাম। বিভিন্ন শ্রেণী, বয়স, পেশার নারী-পুরুষ মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়েছে। এদেশীয় রাজাকার, আলবদরদের সহায়তায় পাকিস্তানীরা নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ-কালীন সময়ে। সনাক্তকরণের মাধ্যমে তারা হত্যা করেছে '১) আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ও সমর্থকদের, ২) কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের, ৩) মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহযোগীদের, ৪) নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়কে, এবং ৫) ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের।'[৩৯] অবশেষে, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ৩০ লাখ শহীদের আত্মদান আর আড়াই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হল বাঙালির পরম আরাধ্য-স্বাধীনতা। সৃষ্টি হল একটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের, জন্ম হল একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাক-হানাদার মুক্ত হলেও অবাঙালি অধ্যুষিত মিরপুর পাক-হানাদার মুক্ত হয়েছিল ৩১ জানয়ারী ১৯৭২ তারিখে। ১৬ ডিসেম্বর পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর পলাতক পাক সেনারা আশ্রয় নিয়েছিল বিহারী অধ্যুষিত মিরপুর এলাকায়। কলকাতা থেকে ১৭ ডিসেম্বর দেশে ফিরে জহির রায়হান জানতে পারেন ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে বড়দা (শহীদুল্লা কায়সার) নিখোঁজ। ৩০ জানুয়ারী ১৯৭২ সকালে একটি টেলিফোন মেসেজের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন মিরপুরে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বড়দার খোঁজে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ঐদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে তিনিও মিরপুর মুক্তি অভিযানে অংশ নেন। পলাতক পাকিস্তানীদের সঙ্গে সংঘর্ষে শতাধিক সেনা ও পুলিশ নিহত হয় এবং জহির রায়হানও সেদিন থেকে নিখোঁজ হন। ধারণা করা হয়, তিনিও সেদিন পাক-সেনাদের হাতে নিহত হন। জুলাই, ১৯৯৯ মিরপুরের ১২ নম্বর সেকশন অন্তর্ভুক্ত মুসলিম বাজার সংলগ্ন নূরী মসজিদ এলাকায় একটি বদ্ধভূমি আবিষ্কৃত হয়। যেখানে খনন কার্য চালিয়ে পাওয়া যায় মানুষের দেহাবশেষ। এ ঘটনা এবং কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে ৩০ জানুয়ারী, ১৯৭২ জহির রায়হানের মৃত্যুর নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪০] এভাবেই, বাংলা কথাসাহিত্যের ধারা থেকে অকালে অবেলায় ঝরে গেল একটি অসাধারণ প্রতিভা, যার শূন্যতা কোন কিছুর বিনিময়েই পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১ । ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩

২ । পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

৩ । পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

৪ । আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ১৯৬৪, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ ঃ ৬৫

৫ । কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ১৩৭৬ স্টুডেন্টস্ পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ১১

৬ । রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৩, ২১

৭ । পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৮ । সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ ঃ বাংলা কথাসাহিত্য*, অক্টোবর, ১৯৯৭, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৯৭

৯ । খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্যসমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ১৯৮৪, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১১৬

১০ । বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, ১৯৯১, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ২

১১ । রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৬, পৃ. ২১

১২ । পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

১৩ । পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১৪ । অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীন ভারত সমস্যা, সাফল্য, ব্যর্থতা, সম্ভাবনা*, দেশ, ৫৮ বর্ষ ৪১ সংখ্যা (সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ), ১০ আগস্ট, ১৯৯১, কলকাতা, পৃ. ১৯ ।

১৫ । কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৫, পৃ. ৯৫-৯৬ ।

১৬ । রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত (পাদটীকা নং ৬) পৃ. ৪৪-৪৫ ।

১৭ । রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৫

১৮ । কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৫, পৃ. ১০৪

১৯ । পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

২০ । বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, (২য় খণ্ড), ১৯৭০, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৯৩

২১ । কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৫, পৃ. ১১৪

২২ । রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৬, পৃ. ৪৬

২৩ । পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

২৪ । পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

২৫ । কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৫, পৃ. ১১৯

২৬ । রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৬, পৃ. ৫১

২৭ । কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ৫, পৃ. ১২০

২৮ । পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

২৯। রফিকুল ইসলাম, *শহীদ মিনার, বাংলা একাডেমী ও বাংলাদেশ, একুশের প্রবন্ধ'৯৪*, জুন ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.১৭-১৯।

৩০। রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৬, পৃ. ৫২

৩১। সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৮, পৃ. ১০০

৩২। একুশের প্রবন্ধ'৯৪, রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২৯

৩৩। কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৫, পৃ. ১২৩

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৩৬। সাইদ-উর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি এবং কবিতা* ১৯৮৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, পৃ. ৬৫।

৩৭। রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৬, দ্রষ্টব্য- দ্বিতীয় অধ্যায়: *বাংলাদেশে উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৫৮-১৯৭০*, পৃ. ৯৭-১১৩

৩৮। শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, একাত্তরের গণহত্যা ও নির্যাতন : সাম্প্রতিক দলিল*, বইমেলা ২০০০, সময় প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১১

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৪০। পূর্বোক্ত, *মিরপুর সদ্য আবিষ্কৃত বধ্যভূমি ও জহির রায়হানের অন্তর্ধান প্রসঙ্গ*, পৃ. ৫৫-৫৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জহির রায়হানের জীবনবোধ

জন্ম ও পারিবারিক প্রতিবেশ

জহির রায়হানের পৈত্রিক নিবাস ছিল নোয়াখালি জেলার (বর্তমান ফেনী জেলা) মজুপুর গ্রামে। এখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর জন্মতারিখটি বিতর্কিত। কোন কোন সমালোচক বলছেন জহির রায়হান-এর জন্ম তারিখ হচ্ছে ৫ আগস্ট, ১৯৩৩; কেউ বলছেন ১৯ আগস্ট ১৯৩৫। জহির রায়হানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহিত্যিক গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের মতে সঠিক তারিখ হচ্ছে ১৯ আগস্ট, ১৯৩৪। আমরা এই তারিখটি গ্রহণ করেছি।[১]

জহির রায়হানের পিতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ এবং মাতা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন[২] সেকালের প্রেক্ষিতে মুক্তদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। পিতামহ মোহম্মদ এমদাদউল্লাহ্ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও আদর্শবান ব্যক্তি ছিলেন। শোনা যায়, নোয়াখালিতে তিনি ওকালতি করতেন। কিন্তু এ পেশায় সর্বদা সত্যাশ্রয়ী থাকা যায়না বলে আইন ব্যবসা ছেড়ে তিনি কলকাতার খিদিরপুরে ব্যবসা শুরু করেন। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে ব্যবসা ক্ষেত্রে সর্বদা তিনি সততা বজায় রেখেছেন।[৩] আরবীতে উচ্চ ডিগ্রী সম্পন্ন জহির রায়হানের পিতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও মুক্তদৃষ্টির অধিকারী হাবিবুল্লাহ্র ইংরেজী শিক্ষার প্রতি সহজাত অনুরাগ ছিল। এ লক্ষ্যে পরবর্তীতে কোলকাতা সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। পিতা হাবিবুল্লাহ্র এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব পড়েছিল অনুজ সিদ্দিকুল্লাহ্সহ গোটা পরিবারের উপর। এ কারণে সম্ভবত তাঁর পরিবারে সাহিত্য সংস্কৃতির একটি মুক্ত এবং অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।[৪] দেশবিভাগের পর ঢাকায় এসে তিনি আলীয়া মাদ্রাসায় ফেকাহ্ ও আরবী দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তৎকালীন পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠতম আলেমদের তিনি ছিলেন একজন। পিতৃসূত্রে সততা, ন্যায়পরায়ণতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬৫ সালে আনুমানিক ৬৭-৬৮ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৫] ইসলামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় নবগঠিত পাকিস্তানে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং ইসলামী

রাজনীতির নেতিবাচক দিকটি জহির রায়হান সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। ফলস্বরূপ, তৎকালীন সময়ে যে গুটিকতক বাঙালি মুসলমান সম্ভ্রান্ত ও ধর্মীয় পরিবার এ বিষেয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল জহির রায়হান এবং তাঁর পরিবার ছিলেন এর অন্যতম।[৬]

জহির রায়হানের মাতা সুফিয়া খাতুন নোয়াখালির এক রক্ষণশীল তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার সে সময় অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। জহির রায়হানের পিতৃকুল মুন্সী পরিবারের সঙ্গে মাতৃকুল তালুকদার পরিবারের একটা চাপা বিরোধ ছিল। বিবাহ সম্বন্ধের মাধ্যমে এই বিরোধ নিস্পত্তির একটা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' উপন্যাসে এরকম একটি চিত্র পাওয়া যায়। সুফিয়া খাতুন নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন। রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তৎকালীন জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সুফিয়া খাতুন ছিলেন ১৩/১৪ বছরের কিশোরী। শোনা যায়, অসহযোগ আন্দোলনে একাত্ম হতে এসময় তিনি নিজ হাতে সুতো কেটে কাপড় বুনে পড়তেন। পরবর্তীকালেও তিনি তাঁর এই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে স্নেহময়ী মাতা সুফিয়া খাতুন ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নশীল।[৭]

জহির রায়হানরা পাঁচ ভাই ও তিন বোন ছিলেন। সবার বড় শহীদুল্লা কায়সার- বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে দেশের এই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ঘাতক আলবদরদের সহায়তায় পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন। দ্বিতীয় নাফিসা কবিরও বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তৃতীয় জহির রায়হান। চতুর্থ জাকারিয়া হাবিব- একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত চিত্র নির্মাতা, চিত্রপরিচালক ও সাহিত্যিক। জহির রায়হানের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর চলচ্চিত্রের অর্থনৈতিক ব্যাপারটি জাকারিয়া হাবিবই দেখাশোনা করতেন। পঞ্চম- সুরাইয়া বেগম একজন চিকিৎসক, ষষ্ঠ সাহানা বেগম, সপ্তম ওবায়দুল্লাহ্ এবং সর্বকনিষ্ঠ সাইফুল্লাহ।[৮]

জহির রায়হান দেখতে খুবই সাধারণ ছিলেন। ছোটখাটো শারীরিক গড়ন, গায়ের রঙ শ্যামলা কিন্তু অসাধারণ ছিল তাঁর প্রাণবন্ত চোখ দুটি। তাঁর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠজনরা সকলেই এ বিষয়ে একমত ছিলেন। বিশিষ্ট লেখিকা রাবেয়া খাতুন জহির রায়হানের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটি স্মৃতিচারণ করে বলেছেন- 'বেটে খাটো, শ্যামলা সাধারণ চেহারার একজন মানুষ, কিন্তু যে জিনিসটি প্রথম দেখাতেই আকর্ষণ করেছিল তা ছিল তাঁর আকর্ষক দুটি চোখ।[৯] পান্না কায়সার বলেছেন- "দেখতে ছোটখাট। ... এক মুহূর্ত স্থির থাকেনা কি যেন খুঁজে বেড়ায় দুচোখের গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে।[১০] সৎ, সরল নির্ভীক, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী জহির রায়হান স্বভাবে ছিলেন অস্থির, উদাসীন, জেদী, কৌতূহলী এবং কিছুটা লাজুক প্রকৃতির। পোষাক- আষাকেও ছিলেন খুবই সাধারণ। সাধারণ শার্ট, প্যান্ট আর পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডেল।

অনুজ শাহরিয়ার কবির জানিয়েছেন - হাওয়াই শার্ট তিনি বেশি পড়তেন। জুতো কখনো পড়তেননা স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন স্বভাবসুলভ উদাসীনতায়। শাহরিয়ার কবির আরো জানিয়েছেন- জহির রায়হানকে সম্ভবত কেউ কখনো স্যুট পড়তে দেখেননি। ১৯৭১ সালে যখন তাঁর মস্কো যাবার কথা ছিল তখন তাঁর জন্য স্যুট বানাতে দেয়া হল। কিন্তু মস্কো যেতে না পারায় সেই স্যুটও তিনি পড়েননি। এভাবেই অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করেছেন জহির রায়হান। নিজের ব্যাপারে জহির রায়হান যথেষ্ট উদাসীন ছিলেন। এই উদাসীনতা এতটাই ছিল যে, "বিকেলে ভুলে যেতো সকালে ও খেয়েছিল কিনা।"[১১] অস্থির-প্রবণতা সম্পর্কে পান্না কায়সার জহির রায়হানের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিচারণায় বলেছেন- 'চোখেমুখে প্রতিভার উজ্জ্বলতা। দৃষ্টির গভীরে কি যেন লুকিয়ে আছে। পকেটে একবার হাত রাখছে, আবার বের করছে। নড়ে নড়ে কথা বলার ভঙ্গি মানুষকে আকর্ষণ করে। মনে হয় একটা চঞ্চল হরিণ। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলা ওর স্বভাব-বিরুদ্ধ।"[১২] জহির রায়হানের পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল অসাধারণ, যে কোন কিছুর কাছাকাছি যাবার একটা সহজাত প্রবণতা ছিল তাঁর মধ্যে। এ প্রসঙ্গে রাবেয়া খাতুন স্মৃতিচারণ করে বলেছেন- তাঁদের 'সিনেমাসিক' পত্রিকা অফিসের সামনের একটি বাড়ীর এক হিন্দু মহিলাকে দেখতেন প্রতিদিন শিল-নোড়ায় সাদা মত কি যেন জিনিস পিষত। এ নিয়ে তাঁর (রাবেয়া খাতুন) ও জহির রায়হানের প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল। কৌতূহল মেটাতে জহির রায়হান একদিন মহিলার কাছে গেলেন এবং দেখতে পেলেন মহিলা মুড়ি বাটছে। কারণস্বরূপ জানলেন, এই বাটা মুড়ি দুধের সরের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া হবে।[১৩] ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় মানুষের কাছাকাছি যেয়ে তাকে বোঝার বা জানার যে সহজাত প্রবণতা তা-ই জহির রায়হানকে একজন জীবনঘেষা সাহিত্যিকে পরিণত করেছিল।

পারিবারিকভাবে অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের গভীর প্রভাব ছিল জহির রায়হানের উপর। বোন নাফিসা কবিরও জহির রায়হানের মানসগঠনে সহায়ক শক্তি ছিলেন। শান্তশিষ্ট জহির রায়হান বড় বোন নাফিসা কবিরের খুব ন্যাওটা ছিলেন। এছাড়া পারিবারিকভাবে আর যে দুজন মানুষ দ্বারা জহির রায়হান প্রভাবিত ছিলেন তাঁরা হলেন চাচা সিদ্দিকুল্লাহ্ এবং চাচী। চাচীর সঙ্গে জহির রায়হানের সম্পর্ক ছিল এক নিবিড় অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। চাচীও জহির রায়হানকে আপন ছেলের মত ভালবাসতেন। ছেলে শাহরিয়ার কবিরের নামকরণও করেছিলেন জহির রায়হানের প্রস্তাবিত নাম থেকে। শোনা যায়, ফটোগ্রাফি শেখার জন্য নিজের গয়না বিক্রি করে তিনি জহির রায়হানকে প্রমথেশ বড়ুয়ার স্টুডিওতে পাঠিয়েছিলেন। সেকালের প্রেক্ষিতে নারী হিসেবে অত্যন্ত আধুনিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন তিনি। এই আধুনিকতা যেমন ছিল জীবনদৃষ্টিতে তেমনি বাহ্যিক আচরণ, পোষাক-আষাকেও। চাচা সিদ্দিকুল্লাহ্র সহায়তায় জহির রায়হানদের পরিবার কোলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যৌথ পরিবার ছিল দু'ভাই হাবিবুল্লাহ্ এবং সিদ্দিকুল্লাহ্র। শহীদুল্লা কায়সার, নাফিসা কবির এবং জহির রায়হানের পড়াশুনার ব্যয়ভার অনেকটাই তিনি (চাচা) বহন করেছেন। তিনজনেরই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল চাচা সিদ্দিকুল্লাহ্র সঙ্গে। মুক্তবুদ্ধির অধিকারী সিদ্দিকুল্লাহ্ সামসময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিন ভাই বোনের সঙ্গে

আলোচনা করতেন। সিনেমা, বেড়ানো সর্বক্ষেত্রেই তিন ভাইবোনের সঙ্গী ছিল চাচা সিদ্দিকুল্লাহ্।[১৪] এ থেকে বোঝা যায় জহির রায়হানের মানসগঠনে চাচা সিদ্দিকুল্লাহ্‌র প্রভাব অনেকখানি ছিল।

জহির রায়হানের পারিবারিক পরিবেশ সেকালের পটভূমিতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। রক্ষণশীলতা ও সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রভাব সেখানে ছিলনা। পুরোনো ঢাকার পাটুয়াটুলির ২৯, বিকে গাঙ্গুলী লেনের লাল রঙের দোতলা বাড়ীর সহযোগিতার হাত আত্মীয়-স্বজন সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রচলিত নিয়মের বাইরে চলতে অভ্যস্ত এ বাড়ীর সকলের অন্যকে কাছে টেনে নেবার একটা অসাধারণ গুণ ছিল। পরিবারের প্রতিটি সদস্য ছিল একে অপরের পরিপূরক। "কি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল একে অপরের সঙ্গে। বুকের সঙ্গে বুক লাগিয়ে বাস করেছে সবাই। যেন স্বর্গলোকের আনন্দময় পরিবেশ।"[১৫] বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখ সবাই সমানভাবে ভাগ করে নিত। পারিবারিক এই পরিমণ্ডল একজন জীবনঘেষা কথাসাহিত্যিক হিসেবে জহির রায়হানের মানসগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

শিক্ষাজীবন

শিক্ষাক্ষেত্রে জহির রায়হানের স্কুল জীবনের অধিকাংশ কেটেছে কলকাতায়। ১৯৪০ সালে তিনি কলকাতায় মডেল স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন মিত্র ইনস্টিটিউশনে। এখানে ৭ম শ্রেণীতে ওঠার পর ভর্তি হন তাঁর পিতার শিক্ষকতাস্থল আলীয়া মাদ্রাসার অ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর জহির রায়হানদের পরিবার চলে আসে পৈতৃক নিবাস নোয়াখালির মজুপুর গ্রামে। এখানে গ্রামের স্কুলে তিনি ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন এবং ১৯৫০ সালে স্থানীয় আমিরাবাদ হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর ১৯৫৩ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এস.সি পাশ করেন। বাবার ইচ্ছানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হলেও সাহিত্যের প্রতি সহজাত অনুরাগ থেকে একবছর পর অর্থনীতি ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। পরে এম.এ. ক্লাশে ভর্তি হলেও নিয়মিত ক্লাশ তিনি করেননি। এ সম্পর্কে তাঁর এম.এ. ক্লাশের সতীর্থ মুহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জানাচ্ছেন-

> চাপা স্বভাবের, বেঁটে-খাটো, মুখাবয়ব কিংবা গলার স্বরও তেমন আকর্ষণীয় নয় এমন একজন সতীর্থ পেলাম, যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্বের এম.এ. ক্লাসে পড়ি। ১৯৫৮-৫৯ সেসনের কথা। আমি এসেছি এম.এ. প্রথম পর্ব থেকে আর উপরোক্ত সতীর্থ এসেছেন বি.এ. অনার্স পাশ করে। ছাত্র হিসেবে সিরিয়াস ছিলেন না। হপ্তায় একদিন কিংবা বড়জোর দুদিন ক্লাসে আসতেন। দু-একটা ক্লাস করেই হুট করে চলে যেতেন। ক্লাসে আসতেনও এমন সময় যখন ঘন্টা পড়ে গেছে, ক্লাসের রোল কলও প্রায় শেষ। চুপটি মেরে পেছনের বেঞ্চিতে বসতেন। হাতে খাতাপত্র থাকতোনা,

> টিউটোরিয়ালও জমা দিতে দেখিনি কোনদিন। আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার কিংবা সেমিনারে বসে বই পড়ার অছিলায় আড্ডা মারার সময় ছিলনা তাঁর। ভীষণ ব্যস্ত মনে হতো তাঁকে। যেন ব্যবসায়ী কেউ, সখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে এসেছেন। বেশ ভূষায় কথাবার্তায় টিপটপ, ছিমছাম।
>
> এমন সতীর্থের প্রতি কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। কদিন পরেই জানতে পালাম ইনিই তরুণ গল্পকার জহির রায়হান; চলচ্চিত্র শিল্পে তখন তাঁর শিক্ষানবিশি চলছে। ডিগ্রীর মোহ ছিলোনা তাঁর। সেসনের শেষের দিকে তাঁকে আর ক্লাসে আসতে দেখিনি। এম.এ. পরীক্ষার ফর্ম পর্যন্ত পূরণ করেননি।[১৬]

কিন্তু আফজালুল বাসার সংশোধনীসহ উল্লেখ করেছেন জহির রায়হান 'এম-এ পরীক্ষার ফরম পর্যন্ত পূরণ করেননি'- এ তথ্য ঠিক নয় তিনি প্রবেশপত্র পেয়েছিলেন।[১৭] আফজালুল বাসারের তথ্য মতে এম. এ. পরীক্ষার প্রবেশপত্র জহির রায়হান পেলেও পরীক্ষায় তিনি অংশগ্রহণ করেননি বিধায় জহির রায়হানের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার এখানেই সমাপ্তি ঘটে।[১৮] ড. মোহাম্মদ হান্নান এবং আরজুমন্দ আরা রানু 'জহির রায়হান: জীবনপঞ্জী'তে উল্লেখ করেছেন ১৯৫৬-৫৮ সময়কালে জহির রায়হান চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়তেন কিন্তু কোর্স শেষ করেননি।[১৯] কিন্তু এ সম্পর্কে জহির রায়হানের পরিবার বা অন্য কোথাও থেকে কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়না। তাঁর ঘনিষ্ঠজনরাও এ সম্পর্কিত কোন উল্লেখ বা প্রামাণিক তথ্য দেননি যাতে করে মনে হতে পারে জহির রায়হান চিকিৎসাশাস্ত্রে ভর্তি হয়েছিলেন। অতএব বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়।

সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে চলচ্চিত্রে আবির্ভাবের পূর্বে জহির রায়হান লেখালেখির জগতে আসেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। খুব দ্রুত তিনি গল্প লিখতে পারতেন এবং লেখার স্টাইল ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সমালোচকের মতে-

> জহির রায়হান লিখতেন অবলীলাক্রমে, ছোটবেলা থেকে তাঁর লেখার অভ্যেস। লিখতেন ছিঁড়তেন আর পড়ে শোনাতে ভালবাসতেন। পরিবারের অনেকেই ছিল তাঁর রচনার একনিষ্ঠ শ্রোতা। জীবনের বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। '৪৭ সনে হিজড়াকে কেন্দ্র করে 'ইন্দ্রানী' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। এ সময়ে একটি কুকুরের রূপ নিয়ে 'মালবিকা' নামের আর একটি গল্প লেখেন।[২০]

স্কুলজীবন থেকেই জহির রায়হান লেখার জগতে প্রবেশ করেন। এসময় তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি কবিতা- 'ওদের জানিয়ে দাও'-

ওদের জানিয়ে দাও
ওরা আমার ভাইবোনকে

কুকুর বিড়ালের মত মেরেছে।
ওদের স্টীম রোলারের নীচে ...

ওদের জানিয়ে দাও।
ওরা দেখেও যদি না দেখে
বুঝেও যদি না বুঝে
আগুনের গরম শলাকা দু'চোখে দিয়ে
ওদের জানিয়ে দাও।
মরা মানুষগুলোতে কেমন জীবন এসেছে।[২১]

কবিতাটি ১৯৪৯ সালে '*নতুন সাহিত্য কুটির*' থেকে প্রকাশিত *চতুষ্কোণ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২২] কথাসাহিত্যধারায় প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প *হারানো বলয়* প্রকাশিত হয় ড. আলিম চৌধুরী এবং এম. এ. কবীর সম্পাদিত *যাত্রিক* পত্রিকায়। সময়টা ছিল ১৯৫১। এসময় তিনি জগন্নাথ কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশের ছাত্র ছিলেন।[২৩]

জহির রায়হান ছাত্রজীবনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে তাঁর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয় সম্ভবত *খাপছাড়া* পত্রিকায়। *যাত্রিক* পত্রিকায় তিনি সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। পত্রিকাটির সম্পাদনায় ছিলেন বড় বোন নাফিসা কবীরের স্বামী এম. এ. কবীর এবং ড. আলীম চৌধুরী। ১৯৫৬ সালে *প্রবাহ* সাহিত্য পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া *অনন্যা*, *সমকাল*, *চিত্রালী*, *যুগের দাবী*, *সচিত্র সন্ধানী*, *সিনেমা* প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।[২৪] এর মধ্যে *অনন্যা*, *প্রবাহ* প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন জহির রায়হান। ১৯৭০ সালে জহির রায়হান *এক্সপ্রেস* নামে একটি ইংরেজী পত্রিকা বের করেন এবং এর যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেন। *এক্সপ্রেস* সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হত এবং তা ছিল একটি রাজনীতি-সচেতন পত্রিকা। প্রথমদিকে কিছুটা রম্য চরিত্র থাকলেও কয়েক সংখ্যা পরই রাজনৈতিক বক্তব্য জোড়ালোভাবে উপস্থাপন করা হয়।[২৫]

জহির রায়হান যেসব পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তার মধ্যে 'সিনেমা' অন্যতম। 'সিনেমা' ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত প্রথম *সিনে-মাসিক* পত্রিকা। প্রকাশকাল ছিল ১৯৪৮-৪৯ এবং সম্পাদনায় ছিলেন ফজলুল হক। প্রথম ২/৩ টি সংখ্যা বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ঢাকা থেকে নিয়মিত ভাবে দশ/বারো বছর ধরে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। শেষদিকে অবশ্য কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। প্রথম প্রকাশের কয়েক বছর পর ফজলুল হক, রাবেয়া খাতুন, কাইয়ুম চৌধুরী এবং জহির রায়হান এই চারজন *সিনেমা* পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সাহিত্য বিভাগটি সম্পাদনা করতেন রাবেয়া খাতুন এবং জহির রায়হান। সিনেমা-বিষয়ক সমালোচনার পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে এই পত্রিকায় ছাপা হত। উৎকৃষ্টমানের সমালোচনা এবং সাহিত্য পাতায় রাবেয়া খাতুন, কাইয়ুম চৌধুরী, জহির রায়হান ছাড়া অন্য যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দীন আল-আজাদ, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, ওবায়দুল হক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত হবার আগে জহির রায়হানের

পোস্টার গল্পটি ছাপা হয়েছিল। গল্পটি তিনি জেল থেকে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। সেকালে সিনেমা পত্রিকাকে ঘিরে বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী-লেখক-শিল্পীদের একটি সাহিত্যিক আড্ডা গড়ে উঠেছিল। প্রতিদিন এই সান্ধ্য আড্ডা বসত সাহিত্য সম্পাদিকা রাবেয়া খাতুনের বাড়ীতে। আর ছুটির দিনের প্রতি দুপুরে রাবেয়া খাতুনের বাড়ীর নিয়মিত অতিথি ছিলেন জহির রায়হান এবং কাইয়ুম চৌধুরী। মাঝে মাঝে আসতেন আলাউদ্দীন-আল-আজাদ। জহির রায়হান, রাবেয়া খাতুন এবং কাইয়ুম চৌধুরীর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। জহির রায়হানের লেখার প্রথম পাঠক ছিলেন রাবেয়া খাতুন এবং কাইয়ুম চৌধুরী। জহির রায়হানের বিখ্যাত উপন্যাস *হাজার বছর ধরে*'র প্রথম নাম ছিল- *ধলপ্রহর*। লেখার পর কাইয়ুম চৌধুরী উপন্যাসটি সম্পর্কে এরকম একটি মন্তব্য করেছিলেন- "তুমি একটি গ্রামের ছবি আঁকতে চাচ্ছ, অথচ তাতে একটি কুকুর নেই, বিড়াল নেই, এ হতে পারেনা।" পরে যখন নতুন করে *হাজার বছর ধরে* নামাকারে প্রকাশিত হয় তখন তা অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আজও *হাজার বছর ধরে* বাংলা কথাসাহিত্যে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশিষ্টতামণ্ডিত উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে জহির রায়হানের চাচী এবং 'ইনল্যাণ্ড প্রেস' (স্বত্বাধিকারী ফজলুল হক, রাবেয়া খাতুন) আর্থিকভাবে সহায়তা করেছিলেন।[২৬]

রাজনৈতিক জীবন

রাজনৈতিক উত্তরাধিকার জহির রায়হান তাঁর কৈশোরকাল থেকেই লালন করে আসছিলেন। সামসময়িক রাজনৈতিক ঘটনা- আন্দোলন জহির রায়হানের কিশোরমানসে ছাপ রেখেছিল, তার প্রমাণ ১৯৪৫ সালে 'ভিয়েতনাম দিবস' এর মিছিলে জহির রায়হানের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জে অন্যান্যদের সঙ্গে কিশোর জহিরও আহত হন। *ভারতছাড়ো* আন্দোলনেও জহির রায়হান অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশ-বিভাগের পর বাংলাদেশে এসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সক্রিয় সদস্য বসন্ত ভৌমিক এবং ক্ষিতিশ চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নিশ্চিতভাবেই এরা জহির রায়হানের রাজনৈতিক চৈতন্যকে প্রভাবিত করেছিলেন।[২৭] কোলকাতা থাকা অবস্থায় বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জহির রায়হানের যোগাযোগ ছিল। অগ্রজ শহীদুল্লা বামপন্থী রাজনীতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সে সূত্রেই এই যোগাযোগ; কোলকাতার একজন প্রসিদ্ধ ছাত্রনেতা হিসেবে শহীদুল্লা কায়সার প্রকাশ্যে ছাত্র ফেডারেশন এবং গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জহির রায়হান পার্টি কুরিয়র হিসেবে কাজ করতেন। এসময় তিনি ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। পার্টির আত্মগোপনকারী সদস্যদের মধ্যে তিনি চিঠিপত্র ও খবর আদান-প্রদানের কাজ করতেন। এছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *স্বাধীনতা* বিক্রি করতেন। এ কাজ অবশ্য প্রকাশ্যেই করতেন। সে সময়ে দলের কর্মীরাই দলীয় কাগজ বিক্রি করতেন। জহির রায়হানের সেই সময়কার রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে তৎকালীন একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা স্মৃতিচারণায় বলেছেন- "তখন ও ভালোভাবে হাফ প্যান্টও পরতে জানতোনা। প্রায় বোতাম থাকতোনা বলে একহাতে ঢোলা হ্যাফপ্যান্ট কোমরের সাথে ধরে রাখতো...।"[২৮] এভাবে সমাজতান্ত্রিক

মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন উত্তরকালের অসামান্য সাহিত্য ও সংস্কৃতিকধর্মী জহির রায়হান।
ঢাকা এসে অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের প্রভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত হন জহির রায়হান। বড় বোন নাফিসা কবির এবং তাঁর স্বামী ড. আহমদ কবিরও জহির রায়হানের রাজনৈতিক চেতনাকে লালন করেছিলেন। তবে -

> "অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের কাজে সহযোগিতার সূত্র ধরেই জহির রায়হান রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৩ /৫৪ সনের দিকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। এ সময় মনি সিংহের দেয়া রাজনৈতিক নাম রায়হান গ্রহণ করেন।"[২৯]

পরবর্তীতে জহির রায়হান পার্টির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন না বটে, তবে সম্পর্কচ্ছেদ করেননি। নিয়মিত চাঁদা দিতেন, খোঁজ খবর রাখতেন, যে কোন প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। পারিবারিক পরিমণ্ডলে বড়দা শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন মস্কোপন্থী, অন্যদিকে বড় বোন নাফিসা কবির ছিলেন পিকিংপন্থী। জহির রায়হান মধ্যপথ অবলম্বন করেছেন সবসময়। মস্কোপন্থীদেরও যেমন চাঁদা দিতেন, তেমনি পিকিংপন্থীদেরও। ১৯৬৬ সালে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট বিভাজনের সময় অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। জহির রায়হান এসময় দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং পার্টি ভাঙার জন্য সরাসরি দলীয় নেতাদের সমালোচনা করেন। নাফিসা কবির এসময় প্রবাসী জীবন-যাপন করলেও দেশে এলে পার্টির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনা করতেন। জহির রায়হান এসময় নাফিসা কবির দ্বারা রাজনৈতিকভাবে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের সময় জহির রায়হান পিকিংপন্থী হয়ে পড়েন অনেকখানি। '৭০-এ এসে তিনি মাও সেতুঙ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এসময় বাংলাদেশের মাও সেতুঙপন্থী দলগুলো বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত ছিল। সবার সঙ্গে জহির রায়হানের যোগাযোগ ছিল এবং মোটা অঙ্কের চাঁদাও দিতেন। এমনকি তাঁর মরিস অক্সফোর্ড গাড়িটি একটি সংগঠনকে দিয়েছিলেন সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য (ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১)। পিকিংপন্থীদের ঐক্য তিনি মনে প্রাণে কামনা করতেন। পাশাপাশি মস্কোপন্থীদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। মস্কোপন্থী অনেক লেখক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতার সঙ্গেও তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নিজে পিকিংপন্থী হওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্ক তিনি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। বড়দা শহীদুল্লা কায়সারের প্রভাব তাঁর উপর এত বেশি ছিল যে তাঁর সামনে কখনোই তিনি মস্কোপন্থীদের সমালোচনা করতেননা। জহির রায়হান তাঁর নির্মীয়মান 'লেট দেয়ার বি লাইট' ছবিটি মস্কো পাঠাতে চেয়েছিলেন।[৩০] এ দৃষ্টান্ত থেকে মস্কোর প্রতি তাঁর অনুরাগের সূত্রটি আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

একাত্তরের ২৫ মার্চ পাক-বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হলে অস্থির, বিচলিত জহির রায়হান মাও সেতুঙ দ্বারা প্রভাবিত হন। দিনের পর

দিন মাও সেতুঙের সামরিক প্রবন্ধাবলী পড়ে এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হন। যুদ্ধে যোগদানের জন্য এককভাবে আগরতলা হয়ে কোলকাতা যান। এসময়ই মুক্তিযুদ্ধের ৭ নম্বর সেকটরে অত্যন্ত স্বল্প সময়ে ও বাজেটে নির্মাণ করেন *স্টপ জেনোসাইড* নামের অপূর্ব ছবিটি। ছবিটিকে সেন্সরবোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেতে জহির রায়হানকে দিল্লী পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। ছাড়পত্র পেয়ে ছবিটির মুক্তির ব্যাপারে তাঁর মস্কোপন্থী ভারতীয় বন্ধুরা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। যদিও ছবিটি তিনি জনসমক্ষে প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি। *স্টপ জেনোসাইড* ছবির ব্যাপারে মুজিব সরকারও বিরোধিতা করেছিল। তার কারণ সম্ভবত এই যে ছবিটির শুরু হয়েছে লেনিনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আর শেষ হয়েছে আন্তর্জাতিক সুর 'জাগো জাগো সর্বহারা' দিয়ে। আরেকটি কারণ হল জহির রায়হান এ ছবিতে সরাসরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছেন যা আওয়ামী লীগের একটি অংশকে ক্ষুব্ধ করেছিল। কারণ আওয়ামী লীগের এই অংশটি তখনও মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও সমর্থন কামনা করছিলেন।[৩১]

স্টপ জেনোসাইড মুক্তির ব্যাপারে মস্কোপন্থী ভারতীয় বন্ধুদের সহায়তার কারণে স্বাভাবিকভাবেই জহির রায়হান তাদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে 'সেই সময়টা ছিল জহির রায়হানের রাজনৈতিক বিভ্রান্তির কাল। কারণ তিনি চীনের তখনকার ভূমিকাকে সমর্থন করেননি এবং প্রায় সর্বদাই মস্কোপন্থীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন।'[৩২] একাত্তরের শেষদিকে এসে জহির রায়হান মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সন্দেহের শিকার হন। মূলত কোলকাতার মস্কোপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জহির রায়হানের সহানুভূতিশীল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলনা। জহির রায়হানের অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল মস্কো দেখার। সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন; অক্টোবরে (১৯৭১) লণ্ডনে বাংলাদেশের একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অধ্যক্ষ এনামুল হক জহির রায়হানকে আমন্ত্রণ জানান এবং রিটার্ন টিকেটও পাঠান। উদ্যোক্তারা জহির রায়হানের অনুরোধেই মস্কো হয়ে লণ্ডন যাবার টিকিট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জহির রায়হান প্রথমেই বিড়ম্বনার শিকার হন ট্রাভেল পারমিট সংগ্রহে এবং পরে মস্কোর ভিসা পেতে। এজন্য তিনি দিল্লী পর্যন্ত গিয়েছিলেন। 'যেহেতু তিনি মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সুনজরে ছিলেন না',- তাই মস্কোতে তারা জহির রায়হানকে দেখতে চাননি। এ কারণেই সোভিয়েত দূতাবাস জহির রায়হানকে মস্কোর ভিসা দেয়া থেকে বিরত থাকে। মস্কো যাওয়া তাই জহির রায়হানের হয়ে ওঠেনি। অনেকদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় জহির রায়হান স্বভাবতই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের আচরণে অত্যন্ত মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।[৩৩] দ্বিধাবিভক্তি এবং দলবিভক্তি সত্ত্বেও জহির রায়হান তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মনে প্রাণে একজন কমিউনিস্ট ছিলেন। বৈশ্বিক মানবিকতাবোধ থেকেই তিনি শ্রেণীস্বার্থ নির্বিশেষে মানুষের সংঘ জীবনচেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। অবরুদ্ধ ও পদদলিত মানবাত্মার সংগ্রাম ও স্বপ্নের সঙ্গে তিনি নিজেকে একাত্ম করেছেন, এই সার্বজনীন বোধ থেকেই তিনি লিখেছেন- *আর কত দিন, ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি, ম্যাসাকার* ইত্যাদি উপন্যাস ও ছোটগল্প।

কৈশোরে কমিউনিস্ট পার্টির একজন পার্টি কুরিয়র হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জহির রায়হানের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা অব্যাহত ছিল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত। পাশাপাশি সম্পৃক্ত থেকেছেন ষাটের দশকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে। ভাষা-আন্দোলনের চেতনা জহির রায়হানের অস্তিত্বের মর্মমূলে প্রোথিত ছিল। যার নিদর্শন মেলে জহির রায়হানের কথাসাহিত্যে, চলচ্চিত্রে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় জহির রায়হান জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তিনি প্রথম কারারুদ্ধ হন। ১৯৫২ সালে ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে ঢাকা শহরে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারীর মাধ্যমে সকল ধরনের সভা-সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নেতাদের দ্বিধান্বিত মনোভাবের বিপরীতে ছাত্রসমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। ২১ ফেব্রুয়ারী(১৯৫২) দলে দলে ছাত্ররা বেরিয়ে আসে রাজপথে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। সেদিনের স্মৃতিচারণ করে শহীদুল্লা কায়সার বলেছিলেন-

> একুশের হরতাল ও জমায়েতকে পণ্ড করার জন্য ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যারাত্রিতে যখন ১৪৪ ধারা জারি করা হল তখনও কেউ বুঝতে পারেনি পরদিন অর্থ্যাৎ ২১ তারিখে কি ঘটবে? কিন্তু মধ্যরাত্রির মধ্যেই অবস্থাটা পাল্টে গেল। মধ্যরাত্রির মধ্যেই ফজলুল হক হল, ঢাকা হল ও সলিমুল্লাহ হলের ছাত্ররা মিটিং করে জানিয়ে দিলেন যে তারা পিছপা হতে রাজী নন। যদি সরকার ভয় দেখিয়ে রক্তচক্ষুর শাসানি ভাষায় রূপান্তরিত করতে চায় তবে এখনই তার ফয়সালা হয়ে যাক। এ মনোভাব এবং সিদ্ধান্ত গোটা আন্দোলনের চেহারাটা পাল্টিয়ে দেয়। তাই আমরা দেখি শুধু পুলিশ নয় মুসলিম লীগের পালা গুণ্ডারা, মহল্লার সর্দাররা স্কুলে স্কুলে ভয় দেখিয়ে বেড়ানো সত্ত্বেও একুশে ফেব্রুয়ারী সব স্কুল কলেজে ধর্মঘট হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"[৩৪]

শহীদুল্লা কায়সার সেই সময়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন। ছাত্ররা ঠিক করেছিল ২১ তারিখ দশজনের দলে দলে ভাগ হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। জহির রায়হান প্রথম দশজন ছাত্রদলের একজন ছিলেন। এ সম্পর্কে জহির রায়হান অনুজ শাহরিয়ার কবিরকে জানিয়েছেন-

> "সিদ্ধান্ত তো নেয়া হল ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে। কিন্তু প্রথম ব্যাচে কারা যাবে? হাত তুলতে বলা হলো। অনেক ছাত্র থাকা সত্ত্বেও হাত আর ওঠেনা। কারণ ক্যাম্পাসের বাইরে পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে পজিশন নিয়ে বসে আছে। ভাবখানা এই যে, বেরুলেই গুলি করবে। ধীরে ধীরে একটা দু'টো করে হাত উঠাতে লাগল। গুনে দেখা গেল আটখানা। আমার পাশে ছিলো ঢাকা কলেজের একটি ছেলে। আমার খুব বাধ্য ছিল। যা বলতাম, তাই করতো। আমি হাত তুলে ওকে বললাম হাত তোল, আমি নিজেই ওর হাত তুলে দিলাম, এইভাবে দশজন হলো।"[৩৫]

এভাবেই ছাত্ররা সেদিন দলে দলে ভাগ হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল। পুলিশ প্রথম কয়েকটি দলকে গ্রেপ্তার করে লালবাগ থানায় প্রেরণ করে। পরে বেপরোয়া হয়ে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য প্রাণ দিল সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার। জহির রায়হনের সহপাঠী সেই সময়ে ঢাকা কলেজের ছাত্র বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর বায়ান্নর সেই আগুনঝরা দিনটির স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে-

> "বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ভিড়; বাইরে ১৪৪ ধারা; সকাল দশটা। চিৎকার শ্লোগান। বাইরে পুলিশ, ... সবাই উত্তেজিত, সবকিছুই অনিশ্চিত, মধ্যে মধ্যে শ্লোগান; রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ... পুলিশ তৎপর, গ্রেপ্তার করছে, খোলা গাড়িতে তুলছে, আর শ্লোগান ॥ রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই; পুলিশ জুলুম চলবেনা। শ্লোগান তো নয় শব্দের প্রতিবাদ।
>
> ... পুলিশ গুলি চালিয়েছে মেডিকেল কলেজের সামনে। কয়েকজন মারা গেছেন। স্বপ্নের মধ্যে মার মুখের মতো চারপাশে বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা আর বাংলাকে গুলি করছে কারা কারা- সমস্ত চেতনায় থরথর ঐ প্রশ্ন।
>
> ... সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে। ... ছাদে আমরাঃ রাত্রি বিদীর্ণ করে শ্লোগান উঠছে নানাদিক থেকে ... মিলেছে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ছাত্রাবাসে, মিলেছে গিয়ে সারা বাংলাদেশে। কোথাও থেকে গুলির শব্দ আসছে। রেডিওতে নুরুল আমীনের গলা, ঘৃণা ঘৃণা ঘৃণা !
> ঘুমতো নয় আশা ও হতাশার নির্যাতন।"[৩৬]

বায়ান্নর পর প্রতি শহীদ দিবসে ছাত্ররা রোজা রেখে প্রভাতফেরীতে অংশ নিত। জহির রায়হানও এর ব্যতিক্রম ছিলেননা।[৩৭] রাজনৈতিক কারণে জহির রায়হান একাধিকবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারীর পর একই বছর জুন মাসে শহীদুল্লা কায়সারকে না পেয়ে পুলিশ জহির রায়হানকে ধরে নিয়ে যায়। তিন মাস জেলবন্দী ছিলেন। এরপর ১৯৫৫ সালে তিন সপ্তাহকাল এবং ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক কারণে তিনমাস কারাবন্দী থাকেন।[৩৮] পরবর্তীতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত জহির রায়হান প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেননি কখনোই। এ সময়ে তিনি লেখালেখি এবং চলচ্চিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। রাজনীতির সঙ্গে যে সম্পর্কচ্ছেদ করেননি এ সময়ের লিখিত রচনাবলী এবং চলচ্চিত্র তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন রচনাবলীতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য জোড়ালোভাবে উপস্থাপন করেছেন।

১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন জহির রায়হান আগরতলা হয়ে কোলকাতা যান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ তিনি করেননি। বরং তাঁর হাতিয়ার ছিল ক্যামেরা। সেলুলয়েডের ফ্রেমে তিনি আবদ্ধ করেছেন মুক্তিযুদ্ধকে। যাবার আগে অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারকে বলেছিলেন-

> "বড়দা, আমি চলে যাব। এখানে থেকে আমি কিছু করতে পারবোনা। এবার আমি আমার স্বপ্নকে কাজে লাগাব। ক্যামেরায় ধরে রাখতে হবে আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস। এতদিন শুধু ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। এবার দিন এসেছে। মানুষের জন্য কাজে লাগাতে হবে আমার ক্যামেরা।" [৩৯]

একাত্তরের ২৫ মার্চ পাক-বাহিনীর আক্রমণের পর দিনের পর দিন নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন জহির রায়হান। ভারত যাবার আগ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারার বেদনা সারাক্ষণ তাঁকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করতো। ভারতে তিনি যান ১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল। কুমিল্লা পর্যন্ত অনুজ জাকারিয়া হাবিব সঙ্গে ছিলেন। ভারত যাবার দিনটির স্মৃতিচারণ করে জাকারিয়া হাবিব বলেছেন -

> "তখন জহিরের খালি পা, পরণে লুঙ্গি, পায়ে আধা ময়লা একটি সার্ট। যাবার পূর্বমহূর্তে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জহির বলেন-
>
> > চলি আবার দেখা হবে, সুদিনে এই বাংলায়। ... আমার জন্য কোন চিন্তা করোনা। পথের মানুষ আমি পথেই নেমে গেলাম।"[৪০]

ভারতে যেয়েই জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধের প্রচার ও প্রসারে নিযুক্ত হন। এজন্য কোলকাতায় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশের যেসব শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিক কর্মী সেসময় কোলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন জহির রায়হান তাঁদেরকে সংগঠিত করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করার উদ্দেশ্যে ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিকের উদ্যোগে *Bangladesh Liberation Council of Intellgentsia* গঠন করেন। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন ড. আজিজুর রহমান মল্লিক এবং সাধারণ সম্পাদক জহির রায়হান। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে জহির রায়হান তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতেন। মুক্তিযুদ্ধে জহির রায়হানের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে জনাব ওয়াহিদুল হক বলেছেন-

> জহির রায়হান ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। কি প্রচণ্ড পরিশ্রমে সংগঠনের জন্য *Bangladesh Liberation Council of Intelligentsia* কাজ করেছে তা বলা যায়না। একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একদিন হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে *জীবন থেকে নেয়া* ছবির একটা প্রিন্ট কলকাতায় এসেছে। সারাদিন খোঁজার পর পাওয়া গেল সেটি। শেরপুর এলাকার একটি সিনেমা হলের মালিক সাহস করে নিয়ে এসেছেন। মালিক জানালেন এটা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং প্রিন্ট তিনি দেবননা। তখন মীমাংসায় বসা হল। জনাব খায়ের (সংসদ সদস্য) এর দায়িত্ব নিলেন। ষাট হাজার টাকা নগদ দেওয়া হল

> মালিককে। এরপর ঠিক হল ছবি দেখিয়ে যা আয় হবে তার অর্ধেক পাবে শিল্পীরা আর বাকিটা পাবে এম.সি.এ। জহির রায়হান নিজে কিছুই নিলেননা। মনে রাখা দরকার সবার আর্থিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ ছিল।[৪১]

সেই দিনগুলোতে জহির রায়হানের আর্থিক অবস্থা এতোটাই খারাপ ছিল যে স্ত্রী পুত্রের খাবার যোগাতে হিমশিম খেয়েছেন। টাকার অভাবে ছেঁড়া চপ্পল পায়ে চলাফেরা করেছেন।[৪২] দেশমাতৃকাকে পাক- বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করতে এসব সাধারণ কষ্ট তিনি হাসি মুখে স্বীকার করেছেন। স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে তিনিও ছিলেন একাত্মপ্রাণ। কোন বাধা, কোন কষ্ট তাঁকে তাঁর ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আগেই বলা হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধে জহির রায়হান যুদ্ধ করেছিলেন ক্যামেরা হাতে। এ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র পরিচালক আলমগীর কবির বলেছেন-

> ২৫'শে মার্চ'৭১ থেকে বাঙালার বুকে বিদেশী দানবের তাণ্ডবনৃত্য। কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় ভুগতে হয়নি জহিরকে...। সে জানতো পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁর কর্তব্য কি।
>
> যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিল্পী সাহিত্যিক স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন কামরুল হাসান, জহির রায়হান, হাসান ইমাম ও অন্যান্য কয়েকজন। দুর্ভাগ্যবশত: অস্থায়ী সরকারের কোন কোন মহলের কাছে জহিরের রাজনৈতিক 'রং' উপাদেয় ছিলনা। ফলে মাঝে মাঝে স্বাধীনতা যুদ্ধে জহিরের অংশগ্রহণের উদ্যম উৎসাহকে রীতিমতো বাধাপ্রদান করা হতো। বলাবাহুল্য জহিরকে নিরস্ত করার ক্ষমতা তাদের ছিলনা। সে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিল আত্মিক তাগিদে। ...
>
> সে জানতো যে দেশ ভালবাসা এবং তাকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা তার জন্মগত এবং আদর্শগত অধিকার। তাই আমরা জহিরকে দেখেছি এক বহুমুখী ভূমিকায়। এ বেলা সে পাক- মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছে, ওবেলা দেখতাম সাংস্কৃতিক দলের অনুশীলনে স্ক্রিপ্ট পুনর্বিন্যাস করছে। যখন কিছু কিছু লোককে দেখেছি নিজেদের ফিল্মের প্রিন্ট বিক্রি করে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বাগাতে সচেষ্ট, ঠিক তখনি দেখেছি জহিরকে তার *জীবন থেকে নেয়া*'র ভারতে বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ সরকারকে দান করতে, স্বীয় অর্থকষ্ট থাকা সত্ত্বেও। ... রাত নেই, দিন নেই, ঘুম নেই *স্টপ জেনোসাইড* তৈরী করছে। ও জানতো বাঙলার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রচারই যথেষ্ট নয়। বিশ্বের সকল পরাধীন শোষিত মানুষের সংগ্রামের সাথে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের একাত্মতা বোঝাতে হবে এই ছবির মাধ্যমে।[৪৩]

১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হল, জহির রায়হান এলেন ১৭ ডিসেম্বর। কোলকাতাতেই অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের নিখোঁজ সংবাদ শুনে তিনি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন। কেননা জহির রায়হানের জীবনের একটি বিশাল অংশ জুড়ে ছিলেন বড়দা শহীদুল্লা কায়সার। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুজন ছিলেন একে

অপরের সম্পূরক। দেশ, রাজনীতি, দেশের মানুষ, চলচ্চিত্র-সাহিত্য সব বিষয়েই তাঁরা খোলামেলা আলোচনা করেছেন, মতবিনিময় করেছেন। মূলত জহির রায়হানের সকল কর্মের মূল উৎস শক্তি ছিল অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সার। শহীদুল্লা কায়সারের নিখোঁজ সংবাদে মানসিকভাবে জহির রায়হান যে কতটা ভেঙ্গে পড়েছিলেন তা তাঁর কথাতেই সুস্পষ্ট,

> 'আমার শরীরের একটা অংশ বড়দা, বড়দা না থাকলে আমারও বেঁচে থেকে লাভ নেই। বড়দা না থাকলে আমি কোন কাজ করতে পারবোনা। বড়দা আমার প্রেরণার মূল শক্তি। ... বড়দাকে ছাড়া আমার জীবনের কিছুই চিন্তা করতে পারিনা। আমি বেঁচে থাকব আর বড়দা নেই তা হতে পারেনা। [৪৪]

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত জহির রায়হান বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁরই সক্রিয় প্রচেষ্টায় গঠিত হয় বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটি। জহির রায়হান নিজে ছিলেন এই কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব ছিলেন ছাত্র-ইউনিয়নের বাশারত আলী।[৪৫] বুদ্ধিজীবী হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে যেয়ে জহির রায়হান অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল তথ্য ও কাগজপত্র উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হয়েছিলেন। এমন কি জামাতের আড্ডাকেন্দ্র রাজাকার আল বদরদের গোপন ঠিকানা, কিছু আত্মগোপনকারী হত্যাকারীর গুপ্ত ঠিকানা পর্যন্ত তিনি উদ্ধারে সক্ষম হয়েছিলেন। তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে জহির রায়হান শ্বেতপত্রও প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।[৪৬] এমনিতর এক পরিস্থিতিতে ৩০ জানুয়ারী ১৯৭২ এক অজ্ঞাত ফোন কল পেয়ে ছুটে যান বিহারী-অধ্যুষিত মিরপুরে অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের খোঁজে। সঙ্গী ছিল অনুজ জাকারিয়া হাবিব, শাহরিয়ার কবির এবং আরো কয়েকজন। এক পর্যায়ে সবাইকে যেতে বলে তিনি একা থেকে গেলেন মিরপুরে। সেই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া। প্রাণপ্রিয় বড়দাকে খুঁজতে গিয়ে নিজেও হারিয়ে গেলেন চিরতরে- 'ভাইয়ে ভাইয়ে প্রাণের এমন মিল ছিল বলেই ওরা দুজনে একই আদর্শের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছিল- আবার একই সংগ্রামের মোহনায় দুজনে হারিয়ে গেল।'[৪৭]

জহির রায়হানের রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, মার্কসীয় দর্শন দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং এই রাজনৈতিকবোধ তিনি তাঁর কৈশোর থেকেই লালন করেছেন। রাজনৈতিক জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন, বিভ্রান্তি, নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা যেমন তাঁকে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করেছে, তেমনি নিজেও পথসন্ধানে দ্বিধান্বিত হয়েছেন। তথাপি একজন প্রগতিশলি ব্যক্তি হিসেবে আজীবন তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এই পথ-পরিক্রমাতেই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। তাই 'বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে জহির রায়হানের অংশগ্রহণ কোন আকস্মিক বা নিছক আবেগতাড়িত ঘটনা ছিলো না। তাঁর রাজনৈতিক জীবন প্রবাহের স্বাভাবিক গতি তাঁকে যুক্ত করেছিল এই আন্দোলনের সঙ্গে। যে কারণে শুধু বায়ান্নতে নয়, ঊনসত্তর বা একাত্তরেও

তাঁকে খোলাখুলি আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়াতে হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক লেখক-শিল্পীদের ভেতর তিনি ছিলেন রাজনীতির প্রতি সবচেয়ে বেশি অঙ্গীকারাবদ্ধ।[৪৮]

বিচিত্র জীবনসংগ্রাম এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মতই জহির রায়হানের কথাসাহিত্য বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময়। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক জীবনচেতনা, বিষয় নির্বাচনের দক্ষতা এবং শিল্প-কুশলতার নিরীক্ষায় সামসময়িক লেখকদের মধ্যে জহির রায়হান ছিলেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সামসময়িক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি যেমন তাঁর কথাসাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তেমনি আঙ্গিক কুশলতায় তিনি যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ কিভাবে সমাজ জীবনে অবক্ষয় সৃষ্টি করেছে তা তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন, পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ কিভাবে সমাজচৈতন্যকে উজ্জীবিত করেছে তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এসবই তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে শিল্পিত করেছেন। জীবন জিজ্ঞাসায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী জহির রায়হানের কথাসাহিত্যে সমন্বিত হয়েছে গ্রাম ও নগর জীবন এবং শিল্পিত হয়েছে সেই জীবনেরই গভীর মনস্তত্ব ও মনোবিকলনের চরম প্রকাশ। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনকেই তিনি তাঁর কথাসাহিত্যের উপকরণ করেছিলেন। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত-নিপীড়িত মুক্তিকামী সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার আর্তি, স্বপ্ন রূপায়িত করেছেন। এজন্য তিনি কোন রূপকের আশ্রয় নেননি। এমনকি আবেগ বা অকারণ উচ্ছ্বাসও কখনো প্রকাশ করেননি। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে জীবন যেমন ঠিক তেমনিভাবেই মধ্যবিত্ত জীবনের অসহায়ত্বকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন জীবনঘেষা কথাসাহিত্যিক হিসেবে জহির রায়হানের স্বাতন্ত্র্য এবং সার্থকতা এখানেই। এজন্য, বোধ করি তাকে বাংলা কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার বললে অত্যুক্তি হয়না। কেননা বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তাঁর মত আর কেউ মধ্যবিত্ত জীবনকে এতোটা শিল্পমণ্ডিত করেননি। প্রাঞ্জল ভাষা, ঋজু দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিনব পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁকে এই আসনে বসাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, সমাজের মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবন অঙ্কনে তিনি সেই জীবনের আর্তি-অসহায়তা, দুঃখ-কষ্ট, আশা-হতাশা, চাওয়া-পাওয়ার অসঙ্গতি, বেদনা-হাহাকারপূর্ণ জীবন সংগ্রামকেই মুখ্য করে তুলে ধরেছেন, শিল্পকে নয়। তাই তাঁর রচিত কোন গল্প বা উপন্যাসে শিল্প নয় বরং জীবনের বাস্তব রূপটিই সেখানে পরিস্ফুটিত হয়েছে। বস্তুত জহির রায়হানের প্রতিটি গল্প উপন্যাসই জীবন থেকে নেয়া- একথা অবশ্যই স্বীকার্য।

তর্থনির্দেশ ও টীকা

১। জহির রায়হানের বন্ধু ও সহযোগী গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেছেন জহির রায়হানের প্রকৃত জন্মতারিখ ১৯ আগস্ট, ১৯৩৪। এই তারিখটিই আমরা গ্রহণ করেছি। দ্র. *স্মরণিকা জহির রায়হান* (গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত), জীবনীকার সারোয়ার জাহান (দ্র. *জীবনী জহির রায়হান, বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, পৃ. ৯) এবং মুহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, জহির রায়হান', শহীদ বুদ্ধিজীবী (স:) ডক্টর মযহারুল ইসলাম ঢাকা,১৯৭৩ পৃ. ২৬৯) ১৯ আগস্ট, ১৯৩৫ তারিখটি গ্রহণ করেছেন। ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী (ভূমিকা, 'জহির রচনাবলী' প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮০ পৃ. ৪-৫) বলেছেন জহির রায়হানের জন্ম তারিখ ৫ আগস্ট ১৯৩৩। সমালোচক আফজালুল বাসার জানাচ্ছেন 'জহিরের প্রকৃত জন্ম তারিখ হচ্ছে ১৯৩৫ সালের ১৯ শে আগস্ট,' দ্রঃ জহির রায়হান : তাঁর সাহিত্য ও অপ্রকাশিত ডায়েরী,' উত্তরাধিকার, মাঘ-চৈত্র, ১৯৯৩,পৃ. ৪০।

২। সারোয়ার জাহান, *জহির রায় হান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

৬। ড. মোহাম্মদ হান্নান ও আরজুমন্দ আরা রানু (সম্পাদক), *উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান*, ১৯৯৮, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, 'ভূমিকা,' পৃ.১১।

৭। সারোয়ার জাহান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১০

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৯। সাক্ষাৎকার, রাবেয়া খাতুন, ১২/৮/২০০০, শনিবার

১০। পান্না কায়সার, মুক্তিযুদ্ধ *আগে ও পরে*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা পৃ. ৯৫

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

১৩। রাবেয়া খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২/৮/২০০০

১৪। শাহরিয়ার কবির, সাক্ষাৎকার, ১০/৮/২০০০, বৃহস্পতিবার

১৫। পান্না কায়সার, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১০, পৃ. ১৩

১৬। '*জহির রায়হান, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে*' (স.) ডক্টর মযহারুল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৭৩, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৬৮

১৭। আফজালুল বাসার, *জহির রায়হান ঃ তাঁর সাহিত্য ও অপ্রকাশিত ডায়েরী*, উত্তরাধিকার, মাঘ-চৈত্র, ১৩৯৩, পৃ. ৪০

১৮। সারোয়ার জাহান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১২

১৯। ড. মোহম্মদ হান্নান ও আরজুমন্দ আরা রানু, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৬, পৃ. ১৫

২০। আফজালুল বাসার, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৭, পৃ. ৮

২১। গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ (স.), 'স্মরণিকা; জহির রায়হান'

২২। ড. মযহারুল ইসলাম, (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২), ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী (পূ., পৃ. ৬) এবং গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত *স্মরণিকা; 'জহির রায়হান*, এ বলেছেন কবিতাটি 'নতুন' সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আফজালুল বাসার সংশোধন করে বলেছেন, 'এ তথ্য ঠিক নয়'। দ্র. আফজালুল বাসার, পৃ. ৩৯

২৩। সারোয়ার জাহান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৩।

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

২৫। শাহরিয়ার কবির, ভূমিকা, *জহির রায়হান*, একুশে ফেব্রুয়ারী, জানুয়ারী, ১৯৯৮, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৯।

২৬। রাবেয়া খাতুন, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯।

২৭। সারোয়ার জাহান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৩।

২৮। শাহরিয়ার কবির, ভূমিকা, *জহির রায়হান, একুশে ফেব্রুয়ারী*, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২৫, পৃ. ৮।

২৯। আফজালুল বাসার, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৭, পৃ. ৬।

৩০। শাহরিয়ার কবির, ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২৫, পৃ. ৯।

৩১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১০

৩২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৩৭। রাবেয়া খাতুন, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯।

৩৮। সারোয়ার জাহান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৪-১৫। মোহাম্মদ হান্নান জানাচ্ছেন ১৯৬১ সালেও রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত 'ডাকসু'র অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আনোয়ার জাহিদের সঙ্গে জহির রায়হানও গ্রেফতার হন। দ্র. *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, *২য় খণ্ড*, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ৫২।

৩৯। পান্না কায়সার, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ১০, পৃ. ৯৬

৪০। জাকারিয়া হাবিব, *মনে এলো : দৈনিক বাংলা*, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩।

৪১। হাসান হাফিজুর রহমান (স.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, ১৫শ খণ্ড*, ঢাকা, ১৯৮৫, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১৯৬।

৪২। পান্না কায়সার, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১০, পৃ. ১৩২

৪৩। আলমগীর কবির, *জহির একটি চেতনা*, 'জহির রায়হান' (স্মরণিকা)।

৪৪। পান্না কায়সার, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১০, পৃ. ১৪৭।

৪৫। শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, 'মিরপুরে সদ্য আবিষ্কৃত বধ্যভূমি ও জহির রায়হানের অন্তর্ধান প্রসঙ্গে', বইমেলা ২০০০, সময় প্রকাশনী, পৃ. ৫৬।

৪৬। পান্না কায়সার, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১০, পৃ. ১৪৯

৪৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৪৮। শাহরিয়ার কবির, ভূমিকা, *জহির রায়হান : একুশে ফেব্রুয়ারী*, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২৫, পৃ. ৭-৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জহির রায়হানের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

জহির রায়হানের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি

কথাসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা উপন্যাস। আভিধানিক সংজ্ঞানুসারে সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শের বর্ণনাত্মক শিল্পরূপ উপন্যাস, যেখানে জীবনের অখণ্ড রূপ প্রকাশমান। জীবনের সমগ্র দিকটি প্রতিবিম্বিত হয় বলে উপন্যাসের পটভূমি হয় বিস্তৃত। আর সমাজ ও জীবনের বিস্তৃত ক্যানভাসে শিল্পিত হয় স্রষ্টার জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা। জটিল ব্যক্তিজীবনই যেহেতু উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় দিক সেহেতু দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিজীবন- সমস্যার সমগ্রতা সন্ধানই ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। এই সমগ্রতা সন্ধানী দৃষ্টির মধ্যেই ঔপন্যাসিক তার বক্তব্য বিষয় উপস্থাপন করেন। ব্যক্তি যেহেতু স্বয়ম্ভু নয় তাই জীবনের যন্ত্রণা, সংঘাত, সমস্যা, বিকৃতি প্রশান্তি ইত্যাদি সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্রিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। জীবনের রূপশিল্পী ঔপন্যাসিক সমাজের সতর্ক দ্রষ্টা, সে কারণে দ্বন্দ্বজটিল ব্যক্তিজীবনকে তিনি বিশ্লেষণ করেন উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র এবং সমাজ-সভ্যতা-রাষ্ট্রের পটভূমিতে বিন্যস্ত করে। এই সামগ্রিক পটে দেখার দৃষ্টিই ঔপন্যাসিকের জীবন দৃষ্টি। সময়বোধ, ইতিহাসবোধ এবং ব্যক্তিজীবন-বোধের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ। লেখকের এই সমগ্র জ্ঞানই জীবনদর্শনরূপে প্রতিফলিত হয় উপন্যাসের শরীরে।[১]

বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের উপন্যাসের মৌল উপজীব্য ছিল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দ্বান্দ্বিক জীবনপ্রবাহ। 'কলোনিশাসিত একটি ভূখণ্ডের আর্থ-উৎপাদন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, তার অন্তর্গত জনজীবনের প্রত্যাশা, অচরিতার্থতা, যন্ত্রণা, সংগ্রামশীলতা, অর্থাৎ অস্তিত্বের সামগ্রিক অভীপ্সাকে রূপায়িত করার মধ্যেই নিহিত এ পর্যায়ের রচিত উপন্যাসের গৌরব।'[২] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দশবছরে বাংলাদেশের উপন্যাসসাহিত্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। পাকিস্তানী শোষণ, সামন্ত মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ, সংগ্রাম ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-৫৭ কালপরিসরে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের গতিশীলরূপ চিত্রিত হয়েছে এ সময়ের উপন্যাসে। পাকিস্তানী সমর্থনপুষ্ট সামন্ত মূল্যবোধ আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপরীতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রত্যাশা-অপ্রাপ্তি, সংগ্রাম, স্বপ্ন-হতাশাকে ঔপন্যাসিকগণ শিল্পরূপ দিয়েছেন। আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তা

সন্ধানের নিগূঢ় অভিপ্রায়ে শিল্পী-চৈতন্য হয়েছে গ্রামজীবনমুখী।[৩] পরবর্তী ১৯৫৮-৭০ কালপরিসরে গভীর থেকে গভীরতর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত-মানস। বস্তুত আইউবী সামরিক শাসন-শোষণ-নিপীড়ন জনজীবনকেই শুধু বিপর্যস্ত করলোনা, সংবেদনশীল শিল্পীসত্তাও হল রক্তাক্ত, আত্মনিমগ্ন, পলায়নমুখর এবং সামসময়িক সমাজজীবন থেকে বিসর্জিত। অক্ষমতা, যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, হাহাকার, আত্মক্ষরণ, আত্মহনন, আত্মদহনে ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা উন্মোচনে ঐকান্তিক ঔপন্যাসিকরা স্বকাল ও সমাজকে অস্বীকার করতে চাইলেন। সমাজজীবন পরিত্যক্ত শিল্পীমানস মূল্যবোধে অবিশ্বাস, প্রেমশক্তিতে অনাস্থা ও জীবনের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণায় আত্মভূক, কুণ্ডলায়িত, মীমাংসাহীন যন্ত্রণাময় অস্থির নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসের যে জীবনচিত্র অঙ্কন করলেন বাংলাদেশের উপন্যাসে তা একান্তভাবেই অভিনব, অভূতপূর্ব।[৪]

জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে আইউবি সামরিক শাসনের ভয়াল দানবীয় শোষণের কাছে অনেক শিল্পীচৈতন্য আত্মসমর্পণ করেছেন একথা সত্য, কিন্তু 'বিপর্যস্ত যুগ-পরিবেশে বাস করেও সমকাল-চঞ্চল জীবনাবেগ, যুগ-সংক্ষোভ এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দ্রোহ-বিদ্রোহ অঙ্গীকার করে মহৎ শিল্পীচৈতন্য অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্য সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানসভূমি। সামরিক শাসনের কাছে নতি স্বীকার করেও অধিকাংশ কথাসাহিত্যিক সমাজ সংক্ষোভ এবং জীবন বাস্তবতাকে ভুলে গেলেও ব্যতিক্রম যে দু'একজন ছিলেন না, এমন নয়। স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলে বাস করেও কোন কোন ঔপন্যাসিক ছিলেন সত্যসন্ধানী, সংরক্ত সমকালস্পর্শী এবং প্রগতিশীল সমাজভাবনায় নিঃসন্দিগ্ধ।'[৫] জহির রায়হান শেষোক্ত ধারার সমাজসত্যসন্ধানী কথাসাহিত্যিক। বিপর্যস্ত যুগ পরিবেশে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে সমাজসচেতন এবং রাজনীতি সচেতন জহির রায়হান হয়ে ওঠেন একজন দায়িত্ববান, নির্ভীক, প্রতিবাদী, জীবনস্পর্শী কথাসাহিত্যিক।

বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে সদর্প যাত্রা শুরু করেন একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা অর্জন করে। আইউব-বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ষাটের দশকের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা জহির রায়হান তাঁর উপন্যাসে সমকালীন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জনজীবনের এক বিশ্বস্ত দলিল অঙ্কন করেছেন।

ষাটের দশকের অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সংগ্রাম ও সংক্ষোভময় জনজীবন জহির রায়হানের উপন্যাসের মৌল উপজীব্য। ভাষা-আন্দোলনের চেতনায় পরিস্নাত জহির রায়হান বাংলাদেশের কথাসাহিত্য তথা উপন্যাসে সমাজবাদী ধারা নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ-হেতু সামাজিক অবক্ষয়, আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক টানাপোড়েন, বিপর্যস্ত গ্রামজীবন, নাগরিক মধ্যবিত্ত- মানসের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, নিপীড়িত

মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামশীলতা, ভাষা আন্দোলন, আন্তর্জাতিকতাবোধ জহির রায়হান উপন্যাসের মূল উপকরণ। তাঁর উপন্যাসের চরিত্র পাত্ররা সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি- শহর কিংবা গ্রামের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ। এদের হতাশা, যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, অসহায়তা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা আর দুঃসহ দৈনন্দিনতায় ভরা জীবনসংগ্রামকে জহির রায়হান তাঁর উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে কথারূপ দিয়েছেন।

জহির রায়হানের জীবনদর্শনের আলোকে আমরা তাঁর উপন্যাসগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু যেহেতু সমাজ ও রাজনীতি সেহেতু সমকালীন সমাজ-বাস্তবতাই আমাদের বর্তমান সমীক্ষার প্রধান বিচার্য বিষয়। আর টেক্সট হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি ড. মোহাম্মদ হান্নান ও আরজুমন্দ আরা রানু সম্পাদিত *উপন্যাস সমগ্র: জহির রায়হান* গ্রন্থটি।

শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০)

রোমান্টিক বাতাবরণে নিম্ন-মধ্যবিত্ত কেরানী জীবনের টানাপোড়েন আর অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত হয়েছে জহির রায়হানের প্রথম উপন্যাস *শেষ বিকেলের মেয়ে* (১৯৬০)। কলোনিসাসিত সমাজের সময়দাস মধ্যবিত্তের স্বপ্নিল সুখময় জীবনাকাঙ্ক্ষা আলোচ্য উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য। কেন্দ্রীয় চরিত্র কাসেদের মাধ্যমে সীমিত আয়ের বাঙালি কেরানীর স্বপ্নময় জীবন-কল্পনা এবং সুখময় ভবিষ্যৎ ভাবনার জগৎ উন্মোচিত হয়েছে *শেষ বিকেলের মেয়ে* উপন্যাসে। স্বভাববৈশিষ্ট্যে কবিত্বশক্তি আরোপ কাসেদ চরিত্রকে সংবেদনশীল করে তুলেছে। তাই সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বিশাল ব্যবধান সত্ত্বেও স্বপ্নবিলাস ও কল্পনাচারিতায় কাসেদ আকাশস্পর্শী।[৭]

জাহানারার প্রতি কাসেদের একতরফা প্রেম, ও তার প্রত্যাখ্যানজনিত স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় শিউলির কাছে আত্মনিবেদন এবং সবশেষে সহজ-সরল অন্তর্মুখী নাহারের ভালবাসার কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে গিয়েছে। কাসেদের রোমান্টিকতার অনুষঙ্গে জাহানারা, সালমা, শিউলি ইত্যাদি চরিত্র বিকশিত হয়েছে। কাসেদ জাহানারাকে ভালবাসে, সাহিত্য-সংস্কৃতি নানা বিষয় নিয়ে দুজনে আলাপ আলোচনা করে। ইকবালের দর্শন নিয়ে যেমন তর্ক করে, তেমনি রবিঠাকুরের কবিতা নিয়েও। কিন্তু মুখ ফুটে কখনোই কাসেদ জাহানারাকে তার ভালবাসার কথা জানাতে পারেনি। কল্পনায় শুধু রঙিন স্বপ্নের জাল বুনেছে -

> একদিন জাহানারাকে বিয়ে করবে কাসেদ। অর্থের প্রতি তার লোভ নেই। একগাদা টাকা আর অনেকগুলো দাসিবাঁদির স্বপ্নও সে দেখেনা। ছোট্ট একটা বাড়ি থাকবে তার, শহরে নয়, শহরতলীতে, যেখানে লাল কাঁকরের রাস্তা আছে আর আছে নীল আর সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে দু-পায়ে কাঁকর মাড়িয়ে বেড়াতে বেরুবে ওরা। সকালে কিংবা সন্ধ্যায়। রাস্তায় লোকজনের ভিড় থাকবেনা। নিরালা পথে মন খুলে গল্প করবে ওরা, কথা বলবে।[৮]

কাসেদের জীবনে শিউলির আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিক। শিউলির প্রগলভতায় কিছুটা অস্বস্তিবোধ করলেও খোলা মনের সহজ সরল এই মেয়েটিকে কাসেদের ভাল লাগে। ভালো লাগে শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় অস্পষ্ট দেখা কেরানী মকবুল সাহেবের কালো মেয়েটিকেও। চাইলেই কাসেদ যাকে বিয়ে করতে পারতো সে আজ বড়সাহেবের স্ত্রী। প্রতিদিন দুপুরে মেয়েটি যখন অফিসে বড় সাহেবের জন্য খাবার নিয়ে আসে কাসেদের রোমান্টিক কবি মন তখন কল্পনাচারী হয়ে ওঠে-

> ...মেয়েটি যখন আসে আর সামনে দিয়ে হেঁটে বড় সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়, তখন কী একটা অস্বস্তিতে ভোগে কাসেদ। ইচ্ছে করে মেয়েটিকে দেখতে। ... মেয়েটি ওর বউ হতে পারতো। ইচ্ছে করলে ওকে বিয়ে করতে পারতো কাসেদ। হয়তো ওকে নিয়ে বেশ সুখী হতে পারতো সে। আজ বড় সাহেবের জন্য খাবার নিয়ে আসে, সেদিন কাসেদের জন্য নিয়ে আসতো মেয়েটি।
> দুজনে একসঙ্গে খেতো ওরা।
> কথা বলতো।
> গল্প করতো।
> কত-না আলাপ করতো খেতে বসে।[৯]

কাসেদের জীবনে নাহার এসেছে সব শেষে। দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া পিতৃ-মাতৃহীন নাহার কাসেদের মায়ের আশ্রয়েই বড় হয়ে উঠেছে আপন মেয়ের মত। নাতিদীর্ঘ, মিষ্টি চেহারার ছিপছিপে মেয়েটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলেনা। মায়ের সেবা আর নীরব গৃহকর্মের মধ্যে দিয়ে দিন কেটে যায় নাহারের। কাসেদের প্রতিও সে যথেষ্ট দায়িত্বশীল-

> যেদিন রাতে কাসেদের ফিরতে দেরি হয়, সেদিন মা ঘুমিয়ে পড়লেও সে ঘুমোয়না। উঠে দরজাটা খুলে দেয়, সাবান, তোয়ালে আর পানির বদনাটা নিয়ে রেখে আসে কলতালায়। খাবারগুলো সাজিয়ে দেয় টেবিলের ওপর। তারপর যতক্ষণ কাসেদ খায়, নাহার নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে। মাঝে শুধু একবার জিজ্ঞেস করে, আর কিছু দেবো? ...
>
> খাওয়া শেষ হয়ে গেলে থালাবাসনগুলো নিয়ে কলতলায় চলে যায় সে। কলতলায় পানি পড়ার শব্দ শোনা যায় অনেকক্ষণ ধরে।[১০]

স্বল্পবাক এই মেয়েটির আচরণ মাঝে মাঝে কাসেদের কাছে অসামাজিক মনে হলেও শেষপর্যন্ত নাহারের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে সে। 'এতকাল যার সাথে ছিলাম, তাকে ছেড়ে থাকতে পারলামনা বলে এসেছি।'[১১] - উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে নাহারের এই দৃঢ় ও সগর্ব প্রচারণার মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছে কাসেদের শ্রান্ত জীবনের পথ-চলা।

জাহানারা, শিউলি, সালমা, নাহার- এই চারটি চরিত্রের মধ্যে শিউলি অনেক বেশি সক্রিয়। সালমা চরিত্রটি যেমন সম্পূর্ণ বিকশিত হয়নি তেমনি জাহানারা সম্পর্কেও পাঠকের দুর্বোধ্যতা রয়ে যায়। উপন্যাস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নাহারের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বও আমরা লক্ষ করিনা। কিন্তু শিউলি চরিত্রটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধারায় বহমান। প্রথম থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একটি চরিত্র হিসেবে পাঠকহৃদয়কে সে আকৃষ্ট করে। উদাহরণস্বরূপ কাসেদ-শিউলির প্রথম পরিচয়ের দিনটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে -

> ... জানেন আমি অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি। ওরা অনেকেই আপনার বয়সী। কেউবা ছোট। কেউ আরো বড়। ওদের সঙ্গে বন্ধু হিসেবেই মিশতাম আমি। আপনি হয়তো বলবেন, এদেশে পুরুষে মেয়েতে বন্ধুত্ব চলতে পারেনা। আমি বলবো, ওটা ভুল। ওটা আপনাদের মনের সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এই যে আমরা দু'জন এক রিকশায় চড়ে বাসায় ফিরছি। লোক দেখে কত কিছুই না ভাবতে পারেন। কিন্তু আমি জানি, আমাদের মনে কোন দুর্বলতা নেই।[১২]

এই স্পষ্ট স্বতঃস্ফূর্ততা অন্য কোন চরিত্রের মাঝে দুর্লক্ষ্য। অন্যদিকে কাসেদ চরিত্রটি লেখকের রোমান্টিক মনের সৃষ্টি। কাসেদের কবিহৃদয় সর্বদা কল্পনাচারী। কেরানী-জীবনের দৈন্য-মালিন্যকে সে স্বভাবসুলভ ঔদাসীন্যে ভুলে থাকে। জীবনে তার কোন উচ্চাশা নেই। জীবনে তার একটিই কষ্ট, আর তা হোল জাহানারার কাছে নিজের হৃদয়-দৌর্বল্য প্রকাশ করতে না পারার অক্ষমতা। এই ব্যর্থতা দুর্বল মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিচয়বাহী হলেও মধ্যবিত্ত কেরানী-জীবনের টানাপোড়েন ও জীবনসংগ্রামের চিত্র কাসেদ চরিত্রে আমরা পাইনা। বরং বৃদ্ধ মকবুল সাহেব ও তার পারিবারিক প্রতিবেশটি অনেক বেশি বাস্তবানুগ ও হৃদয়গ্রাহী-

> লালবাগে একটা সরু গলির ভেতরে একখানা আস্তর-ওঠা একতালা দালান। আর একটা দোচালা টিনের ঘর নিয়ে থাকেন মকবুল সাহেব। বড় পরিবার। ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী।
>
> ... ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের চেয়ে ধুলোবালি আর আবর্জনার আধিপত্য সবার আগে চোখে পড়ে। জানালা দু-খানায় পর্দা সেই কবে লাগানো হয়েছে কে জানে। নিচের দিক থেকে কিসে যেন খেয়ে খেয়ে অর্ধেকটা করে ফেলেছে। বাতাসে মৃদু দুলছে সেগুলো। আর কিছু নয়, শুধু ওই পর্দাগুলোর দিকে তাকালেই গৃহকর্তার দীনতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৩]

সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মকবুল সাহেব। ঘরে রয়েছে তিন তিনটি বিবাহযোগ্য কন্যা, যাদের পাত্রস্থ করবার চিন্তা বৃদ্ধ কেরানীর বয়সকে যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে-

> চোয়ালের হাড়জোড়া আরো উঁচু। দু-চোখ আরো কোটরাগত। বৃদ্ধ কেরানি সহসা মুমূর্ষু রোগীর মতো হয়ে যায়।[১৪]

ব্যক্তিজীবনের এই সংকট সত্ত্বেও দীনতা আর অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য মকবুল সাহেব যে মিথ্যাচারের আশ্রয় নেন তার ভিতর দিয়ে মধ্যবিত্ত মানসের দ্বিধা-দ্বন্দ্বময় ভঙ্গুর চরিত্রটি ফুটে উঠেছে-

> আমি পারতপক্ষে বাসে চড়িনে বুঝলেন, ওতে বড় ভিড়, আমার মাথা ঘুরোয়। আগে রিকশায় করে আসতাম যেতাম। কিন্তু ব্যাটারা এমন হুড়মুড় করে চালায়, দু-বার ট্রাকের নিচে পড়তে পড়তে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। সেই থেকে আর রিকশায় চড়িনে। আজকাল শ্রীচরণ ভরসা করেছি। এতে করে বিকেল বেলার বেড়ানোটাও হয়ে যায়।[১৫]

অল্প পরিসরে বড় সাহেব চরিত্রটিকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখক। অধঃস্তন কর্মচারীদের সাথে স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে ভেসে ওঠে অভাব-অনটনে ভরা তার অতীত দিনগুলো। আর আজ কঠোর শ্রমের দ্বারা ব্যক্তিজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও পারিবারিক সুখ থেকে বঞ্চিত এই মানুষটি একান্তভাবেই নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গ জীবনে ফেলে আসা দিনগুলো এক ঝলক সুখের বাতাসের মতো দোলা দিয়ে যায়। বড় সাহেবের একলা জীবনে শেষপর্যন্ত পূর্ণতার আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত মকবুল সাহেবের কালো মেয়েটি।

তৃষ্ণা (১৯৬২)

জীবনসংগ্রামে পরাজিত মানবাত্মার বেঁচে থাকার অশেষ বাসনা *তৃষ্ণা* উপন্যাসের কথাবস্তু। শওকত, মার্থা, নাচের দলের মেয়ে সেলিনা, বুড়ো আহমদ হোসেন, সহজ সরল মতিন মাস্টার, আজমল আলী, খলিল মিস্ত্রি, মাওলানা সাহেব, মোহসীন মোল্লা, বউ-মারা কেরানী, এমনকি রকে বসে থাকা কুষ্ঠ রোগীটা- উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবমান। আর তা হল শত প্রতিকূলতার মাঝেও টিকে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। জীবনসংগ্রামী এই মানুষগুলোর দুঃসহ দৈনন্দিনতার ভাষারূপ অঙ্কিত হয়েছে শওকত মার্থার- জীবনকাহিনীর মধ্যে দিয়ে। শওকত-মার্থা *তৃষ্ণা* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। বেকার জীবনের দুঃসহ জ্বালা বয়ে বেড়ানো শওকত জীবনসংগ্রামে ব্যর্থ একজন মানুষ। জীবন ও জীবিকার জন্য অনেক কাজই সে করেছে কিন্তু কোথাও থিতু হয়ে বসতে পারেনি-

> ...গত উনিশ বছর ধরে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়েও এখনো জীবনের একটা স্থিতি এলোনা। প্রথমে খিদিরপুরের জাহাজঘাটে, তারপর এক বাঙালিবাবুর আটাকলে। মাঝে কিছুকাল একটা রেলওয়ে অফিসে। ফাইল ক্লার্ক। তারপর কোন এক নামজাদা রেস্তোরাঁর কাউন্টারে। দু-মাস। সেটা ছেড়ে এক মহল-কোম্পানির দালালি করেছে অনেকদিন। এক শহর থেকে অন্য শহরে। ট্রেনে, স্টিমারে। এরপর বছর দুয়েক জনৈক সুতো ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করেছে শওকত। তারপর আগাখানী আহমদ ভাইয়ের আধুনিক বেকারীতে।

> ওখানে বেশ ছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত টিকতে পারলোনা। ছেড়ে দিয়ে একটা আধা-সরকারী ফার্মে টাইম ক্লার্কের চাকরি নিলো শওকত। দশটা পাঁচটা অফিস। মন্দ লাগতোনা। কিন্তু ফাটা কপাল। বেতন বাড়ানোর ব্যাপার নিয়ে একদিন বড় সাহেবের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেলো। আর তার খেসারত দিতে গিয়ে সাতদিনের নোটিশে অফিস ছাড়তে হলো। সেই থেকে আবার বেকার।[১৬]

অস্তিত্বের এই চরম সংকটময় মুহূর্তেও মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টকে বিসর্জন দিতে পারেনি শওকত। যে কারণে মার্থার সহানুভূতিপূর্ণ অযাচিত সাহায্য গ্রহণ করতে তার অহমে বেধেছে। নিদারুণ অর্থকষ্টে থাকা সত্ত্বেও বুড়ো আহমদ হোসেনের নৈতিকতা-বিরোধী চাকরীর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে অবলীলায়। অন্ধকারের চোরাগলির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায়নি শওকত। প্রবল হতাশার মাঝেও এক আলোকোজ্জ্বল জীবনের স্বপ্ন-প্রত্যাশা প্রতিনিয়তই তাকে তাড়িয়ে বেরিয়েছে। এই জীবনতৃষ্ণাই শওকত মার্থাকে একত্রিত করেছে অভিন্ন জীবনবোধে। বিপ্রতীপ সময় ও বিরুদ্ধ সমাজ-প্রতিবেশে মার্থা শওকত দুজনের কেউই শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি কাঙ্ক্ষিত আলো-ঝলমলে জীবনপ্রান্তে।

শওকতের মত মার্থাও জীবনসংগ্রামে ব্যর্থ, ক্ষতবিক্ষত। মার্থাকে শওকত চেনে আধুনিক বেকারীতে কাজ করার সময় থেকে। মার্থা তখন মায়ের সঙ্গে থাকে। এর কিছুদিন পর হাসিখুসি চঞ্চলা মার্থার বিয়ে হয়ে যায় এক অক্সেনওয়ালার ছেলে পিটার গোমেসের সঙ্গে।

> তখন ওর চেহারায় অন্য এক জীবনের চমক এসেছে। স্বামীকে নিয়ে মার্কেটিঙে বেরোয় মার্থা। সিনেমায় যায়, রেস্তোরাঁয় খায়। রাতে বল নাচে।[১৭]

মার্থার সে সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অন্য এক সুখের প্রত্যাশায় মায়ের মত মার্থাও একদিন ভিন্ন পুরুষের হাত ধরে চলে আসে স্বামীর ঘর ছেড়ে। তারপর বিস্ময়করভাবে মায়ের করুণ জীবনের প্রতিফলনই ঘটে গেলো মার্থার জীবনে-

> ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে সত্যি। কিন্তু মার্থার জীবনে তার মায়ের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অমন অবিকলভাবে ঘটে যাবে সে কথা মার্থা কেন শওকতও কোনোদিন কল্পনা করতে পারেনি।[১৮]

সহায়-সম্বলহীন মার্থা বেঁচে গেল রাতকানা লোকটার ওষুধের দোকানে কাজ পেয়ে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মার্থা শওকতের বেকারত্বের কষ্টকে যেমন উপলব্ধি করতে পেরেছে তেমনি শওকত অনুভব করেছে মার্থার যন্ত্রণাকে। এই উপলব্ধিই শওকত ও মার্থার জীবনকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। পরস্পরকে আশ্রয় করে নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে, বাঁধতে চেয়েছে সুখের নীড়। সম্ভাবনাময় আগামীর স্বপ্ন শওকতকে চালিত করে সদর্থক এক জীবনচেতনায় -

> চারপাশের দিকে আজকাল আর নজর পড়ে না শওকতের। কেউ জুয়ার আড্ডায় বসেছে কি বসেনি, কেউ গলা ছেড়ে ঝগড়া করছে কি করছেনা, সেদিকে তাকায় না শওকত। ওসব যেন অর্থহীন হয়ে গেছে তার কাছে। হারুনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর জাহানারার দিন কেমন করে কাটছে। সেই মাতাল কেরানিটা এখনও কি রোজ রাতে তার বউকে মারছে। সে সবের খোঁজ নেয়না সে। যতক্ষণ কিছু ভাবে, ভাবে তিন হাজার টাকার কথা। যতক্ষণ কথা বলে, বলে মার্থার সঙ্গে। পৃথিবী যেন হঠাৎ অনেক ছোট হয়ে গেছে। চিন্তার ধারাগুলো আর বিক্ষিপ্ত নয়, যেন একটা বিন্দুর চারপাশে সারাক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরে মরছে। একটা ঘর, একটা দোকান। একটা সংসার। আর তার জন্যে মাত্র তিন হাজার টাকা।[১৯]

স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র তিন হাজার টাকা, শওকত-মার্থার কাছে যা ছিল দুঃসাধ্য। কিন্তু এই অসাধ্যকেই সাধন করার জন্য মার্থা বেছে নেয় চুরির পথ। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে শেষ পর্যন্ত তার স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে। বেঁচে থাকার প্রবল বাসনাই মার্থাকে বাধ্য করেছে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনে। অন্যদিকে শওকত হত্যা করে মাতাল কেরানীর বৌকে। তারপর ঝড় জলের রাতে নাচের দলের মেয়ে সেলিনার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। বৃষ্টির জলকে শওকতের মনে হয়েছে বন্দিনী মার্থার চোখের জল। দীর্ঘ পথচলার ক্লান্তি শেষে অবশেষে আসে আলোকিত নতুন দিন। কিন্তু এ আলোকিত সকাল মার্থার মতো শওকত-সেলিনার জীবনকেও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

উপন্যাসের অন্য চরিত্রগুলো মার্থা-শওকতের ইতিবৃত্তকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে। কিন্তু লেখকের অভিজ্ঞতা ও চিত্রণ-কৌশলে প্রতিটি চরিত্র হয়ে উঠেছে জীবন্ত ও বাস্তবানুগ। সাবধানী লোক খলিল মিস্ত্রি। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক খলিল মিস্ত্রি কাজে বেরোবার সময় বউকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখে যায়। কাজ শেষে বাড়ী ফিরে বউকে পাশে বসিয়ে পরম আদরে বউয়ের জন্য কিনে আনা সন্দেশ মুখে তুলে খাইয়ে দেয়। অথচ খলিল মিস্ত্রি জানেনা-

> ... যে-লোকটি তার পাশে বসে তাস খেলেছে; যার সঙ্গে দিনের পর দিন সে হাসি, ঠাট্টা আর কৌতুকে মশগুল হয়ে পড়েছে, সে লোকটা আজ সন্ধ্যায় অন্ধকারে সিঁড়ির নিচে তার বউকে নিয়ে শুয়েছিল। সে যদি জানতো, যে তালা দিয়ে সে তার বউকে রোজ বন্ধ করে যায় তার আরেকটা চাবি এর মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে, তাহলে? খলিল মিস্ত্রি এর কিছু জানে না। হয়তো কোনোদিন জানবেওনা। তার অজ্ঞানতা তাকে শান্তি দিক।[২০]

তবুও জীবন থেমে থাকেনা। 'তারপর ডালিমকুমার সাদা ধবধবে একটা ঘোড়ায় চড়ে, ছুটছে তো, ছুটছে তো, ছুটছে'।[২১] আজমল আলীর বুড়ো মা'র

রূপকথার গল্পের মতো জীবনের রথও এগিয়ে চলে বহমান সময়ের পথ ধরে। *বেঁচে থাকার প্রবল তৃষ্ণাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের দিকে।*

তৃষ্ণা উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র মানসিক বিকারগ্রস্ত বুড়ো আহমদ হোসেন, যে নিজেকে পরিচয় দেয় 'মানুষ' বলে। কারাবন্দী একমাত্র ছেলের শোক সে ভুলে থাকে নিষিদ্ধ অন্ধকার জগতের মানুষদের হিসেব কষে। সে নিজেও এই জগতেরই এক বাসিন্দা। আহমদ হোসেন চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে লেখক ঘুণে ধরা সমাজের চিত্রটিকে তুলে ধরেছেন। চরিত্র চিত্রণের পাশাপাশি বর্ণনা, সংলাপ, ভাষারীতিতেও লেখক শিল্পসার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন *তৃষ্ণা* উপন্যাসে। বিশেষ করে কুষ্ঠরোগীটির বর্ণনায় লেখকের দক্ষতা অতুলনীয়-

> সামনে লাল রকটার ওপর একটা কুষ্ঠরোগী কবে এসে ঠাঁই নিয়েছে কেউ জানে না। হাত-পায়ের নখগুলো তার ঝরে গেছে অনেক আগে। সারা গায়ে দগদগে ঘা। চোয়ালজোড়া ফুটো হয়ে সরে গেছে ভেতরে। আর সেই ছিদ্র বেয়ে লাভাস্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিচে। কাঁধে। বুকে। উরুতে। চার পাশে অসংখ্য মাছির বাসা। ভন ভন করে উড়ছে। বসছে। আবার উড়ছে।[২২]

হাজার বছর ধরে (১৯৬৪)

হাজার বছরের সীমানায় প্রসারিত আবহমান বাংলার পল্লী-জীবনের কথারূপ *জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হাজার বছর ধরে।* একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে বৈচিত্র্যহীন নিস্তরঙ্গ পল্লীবাংলার হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ বিজরিত প্রাত্যহিক জীবনকাহিনী ঔপন্যাসিকের রোমান্টিক ও শাশ্বত জীবনচেতনায় গতিশীল রূপলাভ করেছে। উপন্যাস অন্তর্গত চরিত্রগুলো তাই কোন একটি নির্দিষ্ট সময়কালের না হয়ে আবহমান গ্রামবাংলার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। জীবনঘনিষ্ট কথাশিল্পী 'জহির রায়হানের 'দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ময় বিন্যাসে হাজার বছরের মন্থর জীবনস্রোতের মধ্যেও তরঙ্গিত হয়েছে মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা-অচরিতার্থতাজনিত বেদনার রূপবৈচিত্র্য।'[২৩] হাজার বছরের চলমান গতিচ্ছবিকে তুলে ধরতে সময়সচেতন ঔপন্যাসিক কাহিনীর শুরুতেই ইতিহাসচারী হয়েছেন -

> মস্ত বড় অজগরের মতো সড়কটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে। মোগলাই সড়ক।
>
> লোকে বলে, মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে শাহ্ সুজা যখন আরাকান পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন যাবার পথে কয়েক হাজার মজুর খাটিয়ে তৈরি করে গিয়েছিলের এই সড়ক।
>
> দু-পাশে তার অসংখ্য বটগাছ। অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার করে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দীর্ঘকাল ধরে। ওরা এই সড়কের চিরন্তন প্রহরী।[২৪]

উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে পরীর দীঘি পাড়ে অবস্থিত একটি গ্রামের একান্নবর্তী পরিবার নিয়ে । মোট আট ঘর গৃহস্থের এই যৌথ পরিবারে সবাই নিম্নবিত্ত । চাষাবাদ পুরুষদের প্রধান জীবিকা হলেও অন্য অনেক কাজও তারা করে । পুরুষের পাশাপাশি বাড়ীর মেয়েরাও নানারকম বৃত্তিমূলক পেশার সঙ্গে জড়িত । বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশ, আর্থিক অস্বচ্ছলতা আর প্যারিস্পরিক আনন্দ কলহ-বিবাদের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে তাদের জীবনসংগ্রাম । পারস্পরিক মনোমালিন্য সত্ত্বেও বাড়ীর সম্মানের প্রশ্নে সবাই একাত্ম । অশিক্ষিত এই মানুষগুলো কুসংস্কারে বিশ্বাসী, জীবনযাপনে রক্ষণশীল । সামন্ত মূল্যবোধে বিশ্বাসী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিগৃহীত, নির্যাতিত নারী স্বীকৃত হয় ভারবাহী প্রাণীরূপে । আবহমান গ্রামবাংলার এই চিরন্তন চিত্র *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসকে গৌরবোজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য দান করেছে ।

উপন্যাসে বিধৃত প্রচলিত লোককাহিনীর মধ্য দিয়ে পরীর দিঘির জন্মকথা জানা গেলেও গ্রামটির জন্ম ইতিহাস জানা যায়নি । তবে উল্লিখিত পরিবারটির জন্মকথার মাঝে লেখকের সময় সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় ।

> কখন কোন্ যুগে পত্তন ঘটেছিলো এ গ্রামের, কেউ বলতে পারেনা । কিন্তু এ বাড়ির পত্তন বেশিদিন আগে নয় । আশি কি খুব জোর নব্বই বছর হবে । সেই তেরশ' সনের বন্যা ।
>
> অমন বন্যা দু-চার জন্মে কেউ দেখেনি । মাঠ ভাসালো, বাড়ি ভাসালো, ভাসালো কাজীর কুশান ।
>
> কিছু বাদ নেই । ঘর বাড়ি গোয়াল গরু সব । এমনকি মানুষ ভাসলো । জ্যান্ত মানুষ । মরা মানুষ ।[২৫]

প্রলয়ংকারী সেই বন্যায় ভাসতে ভাসতে কুলাউড়ার বাসিন্দা বুড়ো কাশেম শিকদার এসে উপস্থিত হয় পরীর দিঘি গ্রামে । তারপর সঞ্চিত টাকা দিয়ে জমি কিনে গোড়া-পত্তন করেন এ বাড়ীর । বংশ-পরম্পরায় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বুড়ো মকবুল এখন বাড়ির প্রধান কর্তা । অন্য সকলের চেয়ে তার অবস্থা কিছুটা ভালো । বাড়ীর সকলে তাকে মান্য করে, তার পরামর্শমতো কাজ করে । পরিবার-প্রধান হিসেবে সবার ভাল-মন্দের দিকে নজর রাখা মকবুলের কর্তব্য । স্বভাবে অত্যন্ত বৈষয়িক মকবুল তিনটি বিয়ে করেছে । ব্যক্তিগত সুখের জন্য ততটা নয় যতটা সাংসারিক সচ্ছলতার জন্য । মকবুল তার স্ত্রীদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করায় । মকবুলের কাছে তার স্ত্রীরা ভারবাহী প্রাণীসদৃশ -

> ফসলের দিনে সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায়, তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও । বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ির উপরে যে ছোট জমিটা রয়েছে তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয় ।[২৬]

পাশাপাশি নানারকম হাতে তৈরি জিনিস বানিয়ে সংসারের চাকাকে সচল রাখে তার তিন স্ত্রী । এক অর্থে স্ত্রীদের আয়েই সংসার চলে মকবুলের । মকবুলের

মত আবুলও তিনটি বিয়ে করেছে। তবে তার মতো বৈষয়িক নয় আবুল। বরং স্ত্রীদের উপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে এক ধরনের আনন্দ পায় সে।

> বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। পান- বিড়ির মতো এও যেন একটা নেশা হয়ে গেছে ওর।[২৭]

আবুলের এই বর্বরতার কাছে নির্মম বলি হয়েছে তিন তিনটি তাজা প্রাণ। স্ত্রীদের অবশ্য মকবুলও পেটায়। আপাতদৃষ্টিতে সুখী মকবুলের জীবনে একমাত্র অশান্তি তিন সতীনের কলহ-বিবাদ। পারিবারিক এই অশান্তি মকবুলের জীবনকে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তখন হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে স্ত্রীদের পেটায়-

> তাই বলে আবুলের মতো অতো নির্দয় হওয়াটা মোটেই পছন্দ করে না সে। মারবি তো মার, একটুখানি সইয়া মার। অপরাধের গুরুত্ব দেইখা সেই পরিমাণ মার। এ হলো মকবুলের নিজস্ব অভিমত।[২৮]

মকবুলের বৈচিত্র্যহীন শান্ত জীবনে ছন্দপতন ঘটে আম্বিয়াকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ছোট বউ টুনির পরামর্শে বিষয়-সম্পত্তির লোভে মকবুল আম্বিয়াকে বিয়ে করতে রাজি হয়। ব্যক্তিচরিত্রের এই বিপর্যয় তার পারিবারিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পরিবারের সবার বাধার মুখে বিষয়-সম্পত্তির লোভে বড় দুই স্ত্রীকে তালাক দেয়। এই মানসিক আঘাত শেষপর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেনি বৃদ্ধ মকবুল-

> অবশেষে বুড়ো মকবুল মারা গেলো।
>
> ধলপহর দেখা দেবার অনেক আগে যখন সারা গ্রাম ঘুমে অচেতন তখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো সে।[২৯]

এ বাড়ির অপরাপর অংশীদার হল ফকিরের মা, মনু, রশীদ, মন্তু, সুরত আলী আর গনু মোল্লা। গনু মোল্লা সহজ সরল সাদাসিধে মানুষ। লেখকের ভাষায়-

> গনু মোল্লা নির্ভেজাল মানুষ। কারো সাতেও থাকেনা, পাঁচেও থাকেনা। জমিজমা নেই। চাষবাসের প্রশ্ন উঠে না। সারাদিন খোদার এবাদত করে। যেখানে যায় তসবির ছড়াটা হাতে থাকে তার। আপন মনে তসবির পড়ে।[৩০]

আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সুরত আলী, পরীর দিঘি গ্রামের শ্রেষ্ঠ পুঁথি-পড়ুয়া। আগে নিজের জমি চাষ করতো। খাজনার টাকা শোধ করতে জমি বেঁচে দেয়ায় এখন পরের জমিতে বর্গা খাটে। জাগতিক এই দুঃখবোধকে ভুলে থাকতে সুরত আলী সুললিত সুরে কমলা সুন্দরী, ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি পাঠ করে-

> আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে, ভরা চাঁদ খলখলিয়ে হাসে। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাসে অতি ধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায় কাক ডাকেনা। চড়ুই আর শালিক কোনো সাড়া দেয় না। গ্রামের সবাই সারাদিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে কুঁড়েঘরের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে হেলে পড়ে উঠোনের মাঝখানে। তখন সুর করে পুঁথি পড়ে সুরত আলী। গাজী কালুর পুঁথি, ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি।[৩১]

মন্তু-টুনির উপাখ্যান উপন্যাসের কাহিনীকে একটি ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। মন্তুর নিজস্ব কোন জমি নেই। অন্যের জমিতে বর্গা খাটে। কখনো চুক্তিভিত্তিক কাঠুরের কাজ করে বিভিন্ন বাড়ীতে। কখনোবা মাঝিপাড়ার করিম শেখের সঙ্গে ভাগে নৌকা বাওয়ার কাজ করে। জগৎসংসারে মন্তুর আপন বলতে কেউ নেই। একাকী, নিঃসঙ্গ জীবন তার-

> লোকে বলে, মন্তু নাকি বড় একগুঁয়ে আর বদমেজাজি। স্বভাবটা ঠিক জানোয়ারের মতো।
>
> টুনি বলে, অমন মাটির মানুষ নাকি এ জন্মে আর দেখেনি সে।
> আহা অমনটি আর হয়না।[৩২]

টুনি মকবুলের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, সর্বদা হাসিখুশি, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। বুড়ো মকবুলের প্রতি এক ধরনের ক্ষোভ থেকে প্রতিটি মুহূর্ত তার মৃত্যুসংবাদ কামনা করে টুনি। জীবন সম্পর্কে কোন বাস্তব ধারণাই গড়ে ওঠনি কিশোরী টুনির -

> সংসার কাকে বলে সে বোঝেনা। সমবয়সী কারো সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু ভুলে গিয়ে মনের সুখে গল্প জুড়ে দেয়। আর হাসে। হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় টুনি।[৩৩]

কিশোরী টুনির অমিত প্রাণচাঞ্চল্যের সঙ্গী মন্তু। গভীর রাতে দুজনে মিলে মাছ ধরতে বেরোয়, খেজুর গাছ থেকে রসের হাড়ি চুরি করে, কখনোবা ধলপহরের আগে শেওলা আর বাদাবনে ভরা জলাভূমিতে যায় শাপলা তুলতে। এই নিষ্পাপ ছেলেমানুষী আনন্দে ভরা দিনগুলো অকস্মাৎ ভিন্ন পথে মোড় নেয় বাপের বাড়ী থেকে টুনিকে নিয়ে ফিরে আসার পথে শান্তির হাটে। পারস্পরিক দুর্বলতা আর অধিকারবোধ থেকে টুনির মনে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে আম্বিয়ার সঙ্গে মন্তুর বিয়ের পারিবারিক প্রস্তাব কৌশলে ভেঙে দেয় সে। অন্যদিকে যে আম্বিয়ার শারীরিক সৌন্দর্য একদিন মন্তুকে আকৃষ্ট করেছিল আজ তা সে ভুলতে চায় টুনিকে পাবার আকাঙ্ক্ষায়-

> ...বিয়ের কথা ভাবতে গেলে ইদানিং টুনি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের কথা ভাবতে পারে না সে। শান্তির হাটের সেই রাত্রির পর থেকে টুনি তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বসে আছে।

> গ্রামের কত লোক তাদের বউকে তালাক দেয়। বুড়ো মকবুল কেন তালাক দেয়না টুনিকে?[৩৪]

কিন্তু পরিবার প্রধান বুড়ো মকবুলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে টুনির মনোজগতে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। চৌদ্দ বছরের কিশোরী টুনি যেন হঠাৎ করে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে জীবন সম্পর্কে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে সে অস্বীকার করতে পারেনা। মন্তুর প্রতি সমস্ত অধিকারবোধ ছিন্ন করে বুক ভরা যন্ত্রণা আর দীর্ঘশ্বাস চেপে টুনি চলে যায় বাপের বাড়ী। টুনির এই আকস্মিক পরিবর্তন মন্তুকেও কম বিস্মিত করেনি। টুনির অন্তর্জগতের টানাপোড়েন চিত্রণে ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় মেলে-

> সেই নৌকো।
>
> যার মধ্যে চড়িয়ে টুনিকে তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল সে (মন্তু)। দু-ধারে গ্রাম। মাঝখানে নদী। যতদূর চোখ পড়ে শুধু অথৈ জলের ঢেউ...।
>
> সেই নদী।
>
> আগে যেমনটি ছিলো তেমনি আছে। আজ নদীর জলে হাতের পাতা ডুবিয়ে দিয়ে খেলা করলো না টুনি। উচ্ছল দৃষ্টি মেলে তাকালো না কোনোদিকে।[৩৫]

টুনির মত সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি আম্বিয়া। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে দৃঢ় থেকেছে সে। মন্তুকে পাবার আকাঙ্ক্ষা তার মনে সুপ্ত ছিল প্রথম থেকেই। বাবা ও ভাইয়ের মৃত্যুর পর মকবুলের মতো আরো অনেকের বিয়ের প্রস্তাব দৃঢ়তার সাথে ফিরিয়ে দিয়েছে এজন্যই। বিরুদ্ধ সমাজ প্রতিবেশে অরক্ষণীয়া হওয়া সত্ত্বেও নিজের স্থাবর সম্পত্তির ভাগীদার হতে দেয়নি চাচা ছমির শেখকে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী মন্তুকে নিয়ে নানা তির্যক আলোচনা করেছে-

> তবু বারবার মন্তুকে বাড়িতে ডেকেছে আম্বিয়া। ও গেলে সংসারের নানা কথা নিয়ে আলাপ করেছে ওর সঙ্গে।[৩৬]

এই দৃঢ় মনোবলের জোড়েই শেষপর্যন্ত মন্তুকে লাভ করেছে আম্বিয়া। টুনির চপলতা, বাস্তবজ্ঞান, স্পষ্টবাদিতা এবং সংস্কারবিমুখতা যেমন পাঠককে মুগ্ধ করে তেমনি আম্বিয়া চরিত্রের এই দৃঢ়তা, প্রতিবাদী-সত্তা ও সাহসী মনোভঙ্গিও আমাদেরকে আকর্ষণ করে।

বিধবা টুনির বাপের বাড়ী প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটনার সমাপ্তি হলেও বহমান সময়ের চলচ্ছবিকে ঔপন্যাসিক ক্ষুদ্র পরিসরে উপন্যাসের শেষে তুলে ধরেছেন। সময়ের পথ ধরে মকবুলের স্থান নিয়েছে মন্তু। আম্বিয়াকে নিয়ে তার

সুখের সংসার। মকবুলের পর বয়োজ্যেষ্ঠ মন্তু এখন পরিবারের কর্তা, পরিবারের সবার ভালো-মন্দ দেখার দায়িত্ব তার। সুরত আলীর বড় ছেলেটা যখন বাবার মতো সুর করে পুঁথি পড়ে মন্তুর মনে পড়ে যায় সবার কথা-

> আজ উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওদের সবার কথা মনে পড়লো মন্তুর।
>
> বুড়ো মকবুল, রশীদ, আবুল, সুরত আলী।
>
> কেউ নেই।
>
> জীবনের হাটে সকল বেঁচাকেনা শেষ করে দিয়ে একদিন অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা।
>
> টুনির সঙ্গে দেখা হয়নি অনেক বছর।[৩৭]

উপনিবেশ- শৃঙ্খলিত সমাজের বিকাশ প্রক্রিয়া জটিল ও দ্বন্দ্বময় হতে বাধ্য। ১৯৪৭- এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ১৯৭০ পর্যন্ত বিস্তৃত কালপরিসরে বাংলাদেশের বিপর্যস্ত সমাজ-বাস্তবতা মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে এ উক্তির তাৎপর্য অপরিসীম। যে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে ক্রিয়াশীল ছিল কার্যত তার ফল হয়েছিল নেতিবাচক। ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে পূর্ববাংলা পরিণত হয় পাকিস্তানের উপনিবেশে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ পূর্ব পাকিস্তানে ঘটানো হলো সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ। জাতিশোষণ, শ্রেণীশোষণ আর ধর্মশোষণ নাগরিক জীবনকে যেমন বিপর্যস্ত করেছে তেমনি আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তনহীনতা বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে প্রথাজীর্ণ বৈচিত্র্যহীন অবকাঠামোর মধ্যে। জীবনঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী জহির রায়হান সমাজজীবনের এই স্বরূপসত্যকে শিল্পিত করেছেন *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসে। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজজীবনে যে অবক্ষয়ের সৃষ্টি করেছে ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে তা ধরে পড়েছে। এই বিপর্যয়ের মাঝেও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে চিরন্তন জীবনানুভবকে তিনি সন্ধান করেছেন। সুরত আলী আর তার ছেলের বিলম্বিত সুরের পুঁথিপাঠের মতোই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবহমান বাংলার গ্রামজীবন। পূর্ণ চরিত্র নয় বরং জীবনের সমগ্র রূপটিকেই লেখক ধরতে চেয়েছেন আলোচ্য উপন্যাসে। বুড়ো মকবুল, গনু মোল্লা, সুরত আলী, রশীদ, আবুল, ফকিরের মা, ছমির শেখ, নন্তু শেখ,মন্তু, টুনি, আম্বিয়া, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা, হিরণ- উপন্যাস অন্তর্গত প্রতিটি চরিত্রে জীবনের এক একটি খণ্ডিত রূপ অঙ্কিত হয়ে একটি পূর্ণ জীবনাচিত্র প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে। এই মানুষগুলো অতি সাধারণ, বৈচিত্র্যহীন। এই সাদামাটা জীবনকাহিনীকেই লেখক শাশ্বত রূপদান করেছেন। আর সামন্ত মূল্যবোধ আশ্রিত শ্রমনির্ভর শোষণমূলক সমাজে নারীর বিপন্ন অস্তিত্বের যন্ত্রণাময় করুণ আর্তনাদ আবেগী শব্দরূপ লাভ করে মাঝিবাড়ীর মেয়ে আমেনার গানের মধ্য দিয়ে[৩৮]-

> স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার, স্বপ্নে গেলো চইলারে।

দুধের মতো সুন্দর কুমার, কিছু না গেলো বইলারে ।[৩৯]

আঙ্গিক ও প্রকরণগত দিক থেকে *হাজার বছর ধরে* জহির রায়হানের শিল্পসার্থক উপন্যাস। উপন্যাসের ঘটনা এবং চরিত্র উপস্থাপনে লেখক প্রথাগত বর্ণনারীতির আশ্রয় নিয়েছেন। কাব্যিক ব্যঞ্জনা তাতে লক্ষণীয়। দুটো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। তারপর।
তারপর নদীর স্রোত বয়ে চললো। কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি মধুর ছন্দে।[৪০]

২। ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগলো। চাঁদ হেলে পড়লো পশ্চিমে। উঠোনের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। পরীর দীঘির পাড়ে একটা রাত-জাগা পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেলো। সুরত আলীর ছেলে তখনো একটানা পুঁথি পড়ে গেলো।

> কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।
> দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ।
> আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী।
> দুরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূপের পরী।

সুর করে দুলে একমনে পুঁথি পড়ছে সে।

রাত বাড়ছে হাজার বছরের পুরনো সেই রাত।[৪১]

প্রথম উদ্ধৃতিটিতে লেখক প্রবহমান সময়কে নদীর রূপকে উপস্থাপন করেছেন। আর দ্বিতীয় বর্ণনাটিতে হাজার বছরের আবহমান গ্রামীণ চিত্রটিকে তুলে ধরেছেন। ভাষা এবং শব্দ-প্রকরণেও লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় মেলে। একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবনকাহিনী রূপায়ণে লেখক সংলাপে আঞ্চলিক রীতিবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং যথেষ্ট সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ আম্বিয়ার কণ্ঠে গীত আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতটি উল্লেখযোগ্য –

> ভাটুইরে না দিও শাড়ি
> ভাটুই যাবে বাপের বাড়ি।
> সর্ব লইক্ষণ কাম চিক্কণ,
> পঞ্চরঙের ভাটুইরে।[৪২]

আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯)

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের রক্তাক্ত চেতনার স্বাক্ষর জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* পাকিস্তানী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ। পাকিস্তানী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল গণ-আন্দোলনের দিনগুলোতে একুশের চেতনাকে লেখক সঞ্চারিত করেছেন বিক্ষুদ্ধ জনজীবনের মর্মমূলে। একুশের

সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবমান। আসাদ, মুনিম, কবি রসুল, সালমা, এরা সবাই তাই হয়ে উঠেছে সর্বকালের বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের প্রতিবাদী চেতনার স্বাক্ষর।

উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৫৫- এর একুশে ফেব্রুয়ারী হলেও লেখকের সময় ও সমাজবোধের গভীরতর চেতনায় তা হয়ে উঠেছে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎব্যাপ্ত বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭- এর সিপাহি বিদ্রোহ এবং তার পরিণামকে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে লেখকের ইতিহাস-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়-

> শহরে তখন গভীর উত্তেজনা। লালবাগে সেপাহীরা যে কোন মুহূর্তে বিদ্রোহ করবে। যে ক'টি ইংরেজ পরিবার ছিলো তারা সভয়ে আশ্রয় নিলো বুড়িগঙ্গার ওপর গ্রিনবোটে।
>
> খবর পেয়ে যথাসময়ে বৃটিশ মেরিনের সেনারা এসে পৌঁছেছিল আর শহরের এ অংশটা দখল করে তাঁবু ফেলেছিলো এখানে। সে থেকে এর নাম হয়েছিল, আণ্ডারগোরা ময়দান। লোকে বলতো আণ্ডারগোরার ময়দান।
>
> শেষরাতে, লালবাগ নিরস্ত্র সেপাহীদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করেছিলো তারা। মানুষের রক্তে লালবাগের মাটি লাল হয়ে উঠে। কিছু সেপাহী মার্চ করে পালিয়ে যায় ময়মনসিংহের দিকে। যারা ধরা পড়ে তাদের ফাঁসি দেয়া হয় আণ্ডারগোরার ময়দানে। মৃতদেহগুলোকে ঝুলিয়ে রাখা হয় গাছের ডালে ডালে।
>
> লোকে দেখুক। দেশদ্রোহীর শাস্তি কত নির্মম হতে পারে, স্বচক্ষে দেখুক নেটিভরা।[৪৩]

এই রক্তোজ্জ্বল স্মৃতি উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সূত্রপাত এবং লেখকের সময়বোধ ও সংগ্রামী জীবনচেতনার অঙ্গীকারকল্পে *আরেক ফাল্গুন*- এর কাহিনীর মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়েছে এক সার্বজনীন জীবনানুভব। আটচল্লিশের ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের যে ধারা সূচিত হয়, বায়ান্নর ফেব্রুয়ারীতে এসে তা সর্বব্যাপ্ত রূপলাভ করে। ১৯৪৮-১৯৫২ এর প্রস্তুতিপর্বকে স্মরণে রেখে ১৯৫৫- এর একুশে ফেব্রুয়ারী পালনের দিনটি চিত্রিত হয়েছে এ উপন্যাসে।[৪৪] বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন শ্রেণী-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের বাঙালির জাতীয় জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। *একুশে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালনাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানী* শাসকদের বিরুদ্ধে জনসমানসে যে সর্বগ্রাসী ক্ষোভের সঞ্চার হয়, উপন্যাসে মুনিমের বায়ান্নর বাইশে ফেব্রুয়ারীর স্মৃতিচারণার মধ্যে তা লক্ষণীয় -

> কাকডাকা ভোর না হতে সেদিন দলে দলে তারা এসে জমায়েত হয়েছিলো। মেডিকেল কলেজের পুরনো হোস্টেলে। ছেলে। বুড়ো। মেয়ে।
>
> ছাত্র। শ্রমিক। কেরানি।
>
> কত লোক হবে?
>
> কেউ গুণে দেখেনি। আকাশের তারা কি গুণে শেষ করা যায়? যেদিকে তাকাও সমুদ্রের মতো ছড়িয়ে আছে জনতা। আর সবার কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর। এর জন্য বুঝি পাকিস্তান চেয়েছিলাম আমরা? আমাদের ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে মারবার জন্যে? হায় খোদা তুমি ইনছাফ করো এর।
>
> ইনছাফ করো খোদা।
>
> গায়েবি জানাজা পড়ার জন্য সমবেত হয়েছিল ওরা। আর বুড়ো ইমাম সাহেব মোনাজাত করতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, যারা আমাদের কচি ছেলেদের গুলি করে মারলো, খোদা, খোদা তুমি তাদের ক্ষমা করোনা।[৪৫]

ভাষা-আন্দোলনের এই চেতনার মধ্যেই সুপ্ত ছিল বাঙালির পরবর্তী মুক্তিসংগ্রামের বীজ। একুশের প্রেরণাকে মর্মমূলে ধারণ করে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একাত্তরে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়। সংগ্রামী বাঙালি জাতিসত্তার অনিঃশেষ প্রেরণার উৎস-বিন্দু একুশের মর্মকোষ-উৎসারিত চেতনাকে ধারণ করে *আরেক ফাল্গুন*- এর তারুণ্যনির্ভর চরিত্রপাত্ররা হয়ে উঠেছে শৃঙ্খলিত বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের রক্তিম প্রতীক।

১৯৪৭- এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্বৈরাচারী শাসকশক্তি বাঙ্গালি জাতিসত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে দমননীতির আশ্রয় নেয়। প্রথম আঘাত হানে তারা ভাষার উপর। উণচল্লিশে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত নেয় পাকিস্তানীরা। প্রতিবাদ ও আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজ প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করে। বিস্তৃত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শাসকবর্গ বাংলাকে পূর্ব বঙ্গের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হলেও কার্যত তা ছিল পাকিস্তানী শাসকদের একটি চক্রান্ত। প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনের ধারাকে বেগবান করে তোলে এবং জনজীবনে ব্যাপক আলোড়ন জাগাতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে ছাত্রদের ঠেকাতে একুশে ফেব্রুয়ারী সারা ঢাকা শহরে মিছিল শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বিধান্বিত মনোভাবের বিরুদ্ধে জাগ্রত ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেয়। স্বৈরাচারী শাসকবর্গ ছাত্রদের ঠেকাতে মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে। রক্তে রঞ্জিত শহীদের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা রাতারাতি নির্মাণ করে শহীদ মিনার।

স্বৈরাচারী শাসকবর্গ বাঙালির পুণ্যভূমি সে স্মৃতিস্তম্ভকে ভেঙে গুড়িয়ে দিলেও সংগ্রামী ছাত্রসমাজ মাথা-নত-না-করে নব উদ্দীপনায় জেগে ওঠে। বায়ান্নর সেই অগ্নিঝড়া দিনগুলোর স্মৃতিচারণ লেখকের বর্ণনায় হয়ে উঠেছে আবেগস্পর্শী -

> এমনি, আরো একটা রাত এসেছিলো বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে।...
>
> মেডিকেল হোস্টেলের চারপাশে তখন জমাট নিস্তব্ধতা। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার চলাচল নেই। আকাশমুখী গাছগুলো কুয়াশার ভারে আনত। একে একে ছেলেরা সবাই বেরিয়ে এলো ব্যারাক ছেড়ে।...
>
> শহীদ রফিকের গুলিবিদ্ধ খুলিটা চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এসে ছিটকে পড়েছিল ঠিক হলো সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ গড়বে ওরা।
>
> সেখানে প্রায় তিনশো গজ দূরে, মেডিকেল কলেজের একটা বাড়তি ঘর তোলার জন্যে ইট রাখা হয়েছিল স্তূপ করে। এই তিনশো গজ পথ সার বেঁধে দাঁড়ালো ছেলেরা। তারপর হাতে হাতে একঘন্টার মধ্যে চার হাজার ইট সেখান থেকে বয়ে নিয়ে এলো ওরা। স্টোররুমের তালা খুলে তিনবস্তা সিমেন্ট বের করা হলো। দুজন গিয়েছিল রাজমিস্ত্রি আনতে চকবাজারে। সেই শীতের রাতে অনেক তালাশ করে মিস্ত্রি নিয়ে ফিরে এলো ওরা।
>
> সারারাত কাজ চললো। পরদিন সমস্ত দেশ অবাক হয়ে শুনলো সে খবর। তারপর।
>
> তারও দিন চারেক পর আরো একটা খবর শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো সবাই। সরকারের মিলিটারি এসে স্মৃতিস্তম্ভটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেছে।
> কিন্তু ছেলেরা দমেনি। ধুলোয় মেশানো ইটের পাঁজাগুলোকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল ওরা। কয়েকটা গন্ধরাজ আর গাঁদাফুলের চারা লাগিয়ে দিয়েছিলো ভেতরে।
>
> ... সে রাতে মেডিকেলের ছেলেরা কাপড় দিয়ে কঞ্চির ঘেরটা ঢেকে নিলো সযত্নে। বাগান থেকে ফুল তুলে এনে অজস্র ফুলে ভরিয়ে দিলো বেদি। তারপর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইলো ওরা-শহীদের খুন ভুলবো না। বরকতের খুন ভুলবো না।[৪৬]

'বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীর রক্তাক্ত শোকাবহ স্মৃতিকে ভুলিয়ে দেবার জন্য পাকিস্তানী শাসকদের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে ১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ছাত্র-তরুণদের উত্তাল বিক্ষোভ আন্দোলনের ঐতিহাসিক ঘটনার বাস্তবোচিত আলেখ্য জহির রায়হানের আরেক ফাল্গুন।'[৪৭] জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই সূচনাপর্বে ছাত্রীরাও এগিয়ে এসেছিল। শাসকগোষ্ঠী আর রক্ষণশীল সংকীর্ণ সমাজের ভ্রুকুটি

উপেক্ষা করে ছাত্রদের সাথে মেয়েরাও সামিল হয়েছিল বিক্ষোভে আর নগ্নপদ মিছিলে। বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংসের পরিকল্পনাস্বরূপ ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতিচিহ্ন অপসারণে উদ্যোগী হয় নব্য সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী, স্বৈরাচারী শাসকবর্গ। ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপনে স্বৈরাচারী সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করলে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সামরিক নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে মেডিকেল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কালো পতাকা নিয়ে মিছিল-সমাবেশ করে, আর শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করে তোলে চারদিক-

> কণ্ঠে কণ্ঠে এক আওয়াজ, শহীদের খুন ভুলবোনা। বরকতের খুন ভুলবোনা।
>
> যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। পৃথিবী কাঁপছে। ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ছে দিগবিদিক।
>
> শুধু উত্তর নয়। দক্ষিণ নয়। পূর্ব নয়। পশ্চিম নয়। যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছাতে ছাতে, প্রতি ছাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্রযুবক ফেটে পড়ছে চিৎকারে, শহীদ স্মৃতি অমর হোক।
>
> সবাই বুঝলো। বুঝতে কারো বেগ পেতে হলোনা। রাস্তায় শ্লোগান দেয়া নিষেধ। মিছিল শোভাযাত্রা বেআইনি করেছে সরকার। আর তাই ঘরে ঘরে ছাতের ওপরে সমবেত হয়ে শ্লোগান দিচ্ছে ওরা, ছাত্ররা। মুসলিম হল, মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল, চামেরী হাউস, ফজলুল হক হল, বান্ধব কুটির, ইডেন হোস্টেল, নুপূর ভিলা। সবাই যেন এককণ্ঠে আশ্বাস দিচ্ছে, দেশ আমার, ভয় নেই।[৪৮]

তারুণ্যের উন্মাদনায় শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপক্ষো করে সংগ্রাম ও সংরাগের এক অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অকুতোভয় ছাত্রসমাজ। দলে দলে কারাবরণ করে জেলখানাকেই সমগ্র দেশের প্রতিচ্ছবিতে পরিণত করে। এভাবেই সম্ভব হল বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের প্রতীক শহীদ মিনার সংরক্ষণ। ছাত্রদের এই আত্মদান গণবিক্ষোভের রূপ না নিলেও গণজীবনে তা গভীর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। জাতীয় জীবনের সংকটময় মুহূর্তে ছাত্রসমাজের এই নির্ভীক আত্মত্যাগের মাধ্যমে রচিত হল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের দৃঢ় ভিত্তিভূমি।[৪৯]

জীবনবোধের প্রশ্নে *আরেক ফাল্গুন*- এর চরিত্রগুলোকে আলাদা করে চেনা কষ্টকর। সবাই মিলে যেন একটি চরিত্র এবং প্রতিটি চরিত্রই একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ধাবমান। 'বিপ্রতীপ আত্মসুখসন্ধানী চরিত্রও শেষপর্যন্ত মৌল চেতনায় টানে পরিবর্তিত হয়েছে। সালমায় স্মৃতিময় অতীত এবং যন্ত্রণাবহ বর্তমানের মধ্যবর্তী ব্যবধান পাকিস্তান-শাসিত বাংলাদেশের লাল-কালো রেখায় চিহ্নিত, বিভক্ত ও ক্ষতবিক্ষত সময়ের অন্তর্গত ইতিহাসকে ধারণ করেই তাৎপর্যপূর্ণ।'[৫০] জহির রায়হান যখন এ উপন্যাস রচনা করেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন তুঙ্গস্পর্শী। ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত

অভিজ্ঞতায় স্নাত তরুণমানস ক্ষণকালের জন্য বিভ্রান্ত হলেও ১৯৬২ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিলের দাবিকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। আর ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয়দফাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সর্বব্যাপ্ত রূপলাভ করে। ১৯৬৮ সালে সংঘটিত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও সংগ্রামী ছাত্রসমাজ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। সামরিক শাসনামলে জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে আপোষকামী শিল্পীচৈতন্য এবং দ্বিধান্বিত বুদ্ধিজীবী মানসের দোলাচলের মধ্যে শুরু থেকেই সচেতন ছাত্রসমাজ জাতিসত্তার মৌল আকাঙ্ক্ষাকে উজ্জীবিত রেখেছে। ছাত্র-রাজনীতির গৌরবদীপ্ত চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৬৯ সালে জানুয়ারি মাসে ঐতিহাসিক ১১ দফাকে ভিত্তি করে। ঐতিহাসিক ছয় দফা এবং এগার দফার উপর ভিত্তি করে সারাদেশব্যাপী যে গণজাগরণের ঢেউ জেগে ওঠে ভীত সন্ত্রস্ত সামরিক শাসকদের দমননীতির মুখে তা ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। 'জাতীয় জীবনের ঐ অগ্নিমুখী পরিস্থিতিতে জহির রায়হান আলো অন্ধকারের দোদুল্যমানতা থেকে উপন্যাস - অন্তর্গত চরিত্র সমূহকেই কেবল মুক্তিদান করেননি, জাতির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। উপন্যাসের শেষে উচ্চারিত সংলাপে সে সত্যেরই ইঙ্গিত বিদ্যমান।'[৫১]

> ... কবি রসুল চিৎকার করে উঠলো, জেলখানা আরো বাড়ান সাহেব। এত ছোট জেলখানায় হবেনা।
>
> আর একজন বললো, এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুন হবো।[৫২]

বরফগলা নদী (১৯৬৯)

কলোনিশাসিত বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক প্রতিবেশে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের সামগ্রিক ভাঙনের শব্দরূপ '*বরফ গলা নদী*।' বিরুদ্ধ প্রতিকূল পরিবেশে শাহরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহির্জাগতিক ও অন্তর্জাগতিক টানাপোড়েনের চিত্রটিকে ঔপন্যাসিক সমাজসংলগ্ন বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত কেরানী হাসমত আলীর পরিবারকে কেন্দ্র করে। হাসমত আলীর পারিবারিক প্রতিবেশের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাত্যহিক জীবনের চলমান রূপটি অঙ্কিত হয়েছে। বিশেষত হাসমত আলীর জীর্ণ বাড়িটির অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য যেন উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয় আর অন্ধকারের ভাষারূপ-

> শহরে সন্ধ্যা নামার অনেক আগে এখানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বাইরে যখন বিকেল, এ গলিতে তখন রাত। আর বাইরে যখন ভোর হয়, তখনো এ গলিতে তমিস্রায় ঢাকা থাকে। অনেক বাধা ডিঙিয়ে, অনেক প্রাসাদের চুড়ো পেরিয়ে তবে এখানে প্রবেশের অধিকার পায় সূর্য। এ পাড়ার বাসিন্দাদের বড় সাধনার ধন সে। তাই বেলা দুপুরে যখন এক চিলতে রোদ এসে পড়ে এই হীন দালানগুলোর ওপর, তখন তার বাসিন্দারা বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো রোদে

> বিছিয়ে দেয় তারা। খানিক পরে ধীরে ধীরে আবার সূর্যটা পশ্চিমে নেমে যায়। কে যেন জোর করে টেনে নিয়ে যায় তাকে। তখন এখানে অন্ধকার। অন্ধকার শুধু।[৫৩]

হাসমত আলী একজন স্বল্প আয়ের কেরানী। স্ত্রী আর পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে সীমিত আয়ের সংসারে প্রতিনিয়ত অভাব আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচা। অর্থাভাবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ যেমন তিনি জোটাতে পারেননি তেমনি পারেননি একটি ভদ্রস্থ নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা দান করতে। এই অক্ষমতা কেরানী হাসমতের মননে একধরনের অপরাধবোধের সৃষ্টি করেছে। এই অপরাধবোধ থেকেই পিতৃসুলভ অধিকারে ছেলেমেয়েদের শাসন করতে দ্বিধাবোধ করেছেন। হাসমত আলীর গ্লানিবোধ আরো গভীরতর হয়েছে বড় মেয়ের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী মনসুয়ের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। এই অযাচিত সাহায্য তার মর্মপীড়ার কারণ হলেও অসহায়তাবোধ থেকে প্রতিবাদ জানাতে পারেননি। মাহমুদের স্বেচ্ছাচারী বোহেমিয়ান জীবন পরিবারের সকলের বিরক্তি ও উদ্বেগের কারণ হলেও হাসমত আলী এ ব্যাপারে একে বারে নীরব। পারিবারিক নিশ্চয়তার স্বার্থ-সম্পর্কিত প্রশ্নে বরং ছেলের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তার মানসিক সমর্থন রয়েছে-

> ... মাহমুদকে কোন কারণে রাগাবার পক্ষপাতী তিনি নন। স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা দোষ থাকলেও সে নিশ্চয় বখাটে ছেলে নয় তা বোঝেন হাসমত আলী। সংসারে টাকা-পয়সা দিয়ে প্রতিমাসে সাহায্য করেছে সে। লেখাপড়া আর জানাশোনার দিক থেকেও বাবার চেয়ে সে অনেক বড়। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের সকলের ভবিষ্যৎ ওর হাতে নির্ভর করছে। নিজে যে কোন সময়ে মারা যেতে পারেন, সে জ্ঞান রাখেন হাসমত আলী। তখন মাহমুদ না থাকলে কে দেখবে ওদের? ... দিন সব সময় এক রকম যায়না। মাহমুদ একদিন একটা ভালো চাকরি পেয়ে যেতে পারে সে আশাও রাখেন হাসমত আলী।[৫৪]

কর্মব্যস্ততার অবকাশে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনারত হাসমত আলীর স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাগুলো তাই বড় ছেলে মাহমুদকে ঘিরে ডালপালা বিস্তার করে। শেষপর্যন্ত তার স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটেছে জীর্ণ বাড়িটি ধ্বসে পড়ার মধ্য দিয়ে। হাসমত আলীর জীবনাচরণে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট যেমন প্রকটিত হয়েছে তেমনি ধ্বসে পড়া জীর্ণ বাড়ীটি সমকালীন সমাজজীবনের বিপন্নতাকে তুলে ধরেছে।

মাহমুদ আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর মাহমুদ পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে মেট্রিক পাশের পর নিজেই পড়াশুনার খরচ জুগিয়ে বি. এ. পাশ করেছে। লুই ফিশারের মতো সৎ, নির্ভীক, আদর্শ একজন সাংবাদিক হবার বাসনায় মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে *মিলন* পত্রিকায় সাব এডিটরের চাকরী নেয়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এসে তার এ স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে। শ্রেণীস্বার্থের কাছে পরাজিত হয় ব্যক্তিগত আদর্শবোধ। সাংবাদিকতার নামে গণিকাবৃত্তি মাহমুদের মাঝে জন্ম দেয় ক্ষোভের-

> সাংবাদিক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে আজ সে লজ্জাবোধ করে। সে তো সাংবাদিক নয়, মালিকের হাতের একটি যন্ত্রবিশেষ। কর্তার ইচ্ছে মতো সংবাদ তৈরি করতে হয় তাকে। তারই ইচ্ছেমতো বিকৃত খবর পরিবেশন করতে হয়। মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মন। তখন সে ভাবে, যদি তার টাকা থাকতো তাহলে নিজে একখানা পত্রিকা বের করতো মাহমুদ। সুস্থ সাংবাদিকতা হতো যার আদর্শ।[৫৫]

নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনে মাহমুদের এই স্বপ্ন কল্পনা-বিলাসিতারই নামান্তর। আদর্শ আর বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত মাহমুদ একসময় পত্রিকা অফিসের চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে একটি প্রেসে প্রুফ রিডারের চাকরি নেয়। সাংবাদিক মাহমুদের মধ্য দিয়ে লেখক সমকালীন সমাজসত্যের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানী শাসকবর্গ সর্বক্ষেত্রে বাঙালির মৌল অধিকারকে ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে নানারকম কৌশল ও ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। বাক-স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ তাদের সেই হীন চক্রান্তেরই বহিঃপ্রকাশ। বি.এন.আর., প্রেস ট্রাষ্ট, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড ইত্যাদি নানা সংস্থা প্রতিষ্ঠাসহ সংবাপত্রের উপর সেন্সরশীপ আরোপ করে স্বাধীন মত-বিকাশের পথকে করা হয় অবরুদ্ধ। মাহমুদের বিপন্ন সাংবাদিক সত্তার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তৎকালীন সেই সমাজ-সত্যকেই শব্দরূপ দিয়েছেন।

পুঁজিবাদ-নির্ভর বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা মাহমুদের মাঝে জন্ম দিয়েছে শ্রেণীসচেতনতার। জীবনসংগ্রামে ব্যর্থ মাহমুদের সমস্ত ক্ষোভ বর্ষিত হয়েছে সমাজের ওপর তলার মানুষের প্রতি, যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক জীবন-কাঠামো। সমাজের সুবিধাভোগী, স্বার্থপর শ্রেণীচরিত্রটির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে মনসুর প্রসঙ্গে মাহমুদের উক্তির মধ্য দিয়ে -

> ... এ দেশে ক'টা লোক আছে যে চরিত্র ঠিক রেখে বড়লোক হতে পেরেছে? অন্যকে ফাঁকি দিয়ে ধোঁকাবাজি আর লাম্পট্য করে, শোষণ আর দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়েছে সব। তাদের আবার চরিত্র।[৫৬]

শ্রেণীসচেতন, বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মাহমুদ শেষপর্যন্ত শোষণমূলক সমাজের অব্যবস্থাকে উত্তরণে ব্যর্থ হয়েছে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি পারিবারিক বিপর্যয়ে রিক্ত নিঃস্ব মাহমুদ আত্মসমর্পণ করেছে লিলির ভালবাসার কাছে। পাঁচবছর পরে বইয়ের ভিতর পাওয়া পুরনো একটি ফটোগ্রাফকে কেন্দ্র করে মাহমুদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে -

> ... জীবনটা কি কারো অপেক্ষায় বসে থাকে? আমাদেরও একদিন মরতে হবে। তখনো পৃথিবী এমনি চলবে। তার চলা বন্ধ হবেনা কোনদিন। যে শক্তি জীবনকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে, তার কি কোন শেষ আছে লিলি?[৫৭]

*বরফ গলা নদী*র মরিয়ম চরিত্রটির মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে ব্যর্থ, ক্ষতবিক্ষত, যন্ত্রণাকাতর একজন মানুষের বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। হাসমত আলীর বড় মেয়ে মরিয়ম একদা ভালবেসে ঘর ছেড়েছিল জাহেদ নামের একটি ছেলের হাত ধরে। কৈশোরের সেই প্রেম বাস্তবের নির্মম আঘাতে হয়েছে পদদলিত। ব্যক্তিজীবনের এই অসঙ্গতি থেকেই মনসুরকে প্রথমে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি মরিয়ম। অতঃপর পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়েছে মরিয়ম। বিয়ের পর হাসি আর আনন্দের অফুরান স্রোতে কোথা থেকে কেটে গিয়েছে দুটি মাস। সুখীয়াল স্বপ্নে ভরা দিনগুলো সহসা অন্ধকারের কালো মেঘে ঢাকা পড়ে যায় মনসুর কর্তৃক মরিয়মের অতীত ইতিহাস উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। দাম্পত্য জীবনে মিথ্যাচারের আশ্রয় না নিয়ে মরিয়ম অকপটে তার কালিমালিপ্ত অতীত ইতিহাসকে তুলে ধরেছে মনসুরের কাছে। এই সত্যকথন ঈর্ষা আর ঘৃণার বিষবাষ্পকে উস্কে দেয় প্রথাগত মূল্যবোধে বিশ্বাসী মনসুরের হৃদয়ে যা তাদের বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু মরিয়ম বুঝতে পারেনা কোথায় তার ভুল-

> ... সত্যকে ঢেকে রাখার কি অর্থ হতে পারে। মরিয়ম জাহেদকে ভালবেসেছিলো। হ্যাঁ, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আপনার করে নিতে চেয়েছে। দুটোই সত্য। মরিয়ম বুঝতে পারেনা এ সত্যের সহজ স্বীকৃতিতে ভুল কোথায়? সেকি মিথ্যার মুখোশ পড়লে মনসুর সন্তুষ্ট হতো? দুবার কি মানুষ প্রেমে পড়তে পারেনা? মনসুর কেন এমন হয়ে গেলো? হাসিভরা জীবনের মাঝখানে অশ্রু কেন এলো?[৫৮]

এই আত্মজিজ্ঞাসা নিয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে মরিয়ম। এদিক থেকে মরিয়মের চেয়ে লিলি বরং অনেক বেশি বাস্তববাদী। পুরুষশাষিত সমাজে যে প্রতারণার স্বীকার মরিয়ম হয়েছে লিলি তা অস্বীকার করেছে চারিত্রিক দৃঢ়তায়। মরিয়মের মতো লিলিরও দু'বার ব্যর্থ প্রেমের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু মরিয়মের মতো নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সুখের পথকে কন্টকাকীর্ণ করেনি সে। কারণ লিলি জানে -

> ... এ সমাজে বাঁচতে হলে মিথ্যের মুখোশ পড়ে চলতে হয়।[৫৯]

বাস্তব জীবন সম্পর্কে লব্ধ এই অভিজ্ঞতাই মাহমুদ-লিলির দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও সার্থক করে তুলেছে। উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র আমেনা। স্বল্প-পরিসরে ঔপন্যাসিক আত্মসম্মান-বোধসম্পন্ন আমেনা চরিত্রের যে বিকাশ দেখিয়েছেন পাঠক হৃদয়কে তা আকৃষ্ট করে। পারিবারিক অমতে আমেনা বিয়ে করে প্রেসমালিক শাহাদাতকে। স্বামীর ঘরে প্রবল অর্থকষ্টে দিন কাটালেও কখনো তার বড়লোক ভাইদের কাছে সাহায্যের হাত পাতেনি সে। স্বামীকেও চাকরি করতে দেয়নি, কারণ চাকরীর নামে অন্যের গোলামি করার মাঝে সম্মানের কিছু দেখেনি সে। নিজের অলংকার বেচা টাকা দিয়েও প্রেসটিকে যখন আর চালানো গেলনা তখন ভাগ্য ফেরাবার লক্ষ্যে স্বামী সন্তানসহ আমেনা এই শহর ছেড়ে অন্য শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে। কারণ-

> সে চায়না তাদের এই ক্ষয়ে ক্ষয়ে তলিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সকলে দেখুক, উপভোগ করুক-বিশেষ করে তার ভাইয়েরা, তাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা। ওদের চোখের কাছ থেকে নিজের দীনতাটুকু আড়াল করে রাখতে চায় আমেনা। ... এককালে সে প্রেস মালিকের বউ ছিল, তার ভাইয়েরা এখনো রাস্তায় মোটর হাকিয়ে বেড়ায়- এ খোঁজ কাউকে দেবেনা আমেনা।[৬০]

আমেনার এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই উপন্যাসের অন্যান্য নারী চরিত্র অপেক্ষা তাকে ভিন্ন একটি স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখ্যযোগ্য চরিত্র খোদা বকস। 'বিশ্রামাগার' নামে একটি ছোট্ট রেস্তোরার মালিক সে।তার খদ্দেররাও সব নিম্নবিত্ত আয়ের, অধিকাংশই বাকিতে খায়। তবু -

> খদ্দেরদের রাগাতে মোটেই প্রস্তুত নয় খোদাবক্স। তাহলে ব্যবসার ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ছোটখাটো রেস্তোরাঁ যারা চালায় তাদের পক্ষে এটা একটা অভিশাপস্বরূপ।[৬১]

খোদাবক্স তার খদ্দেরদের মঙ্গল কামনা করে, বেকারত্ব ঘুচিয়ে সবাই যাতে ভালো একটা চাকরি পায় সেজন্য চাকরীর বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করে। এই উপকারের মাঝেও তার ব্যবসায়িক বুদ্ধি ক্রিয়াশীল, কেননা এতে করে তার বাকি টাকাগুলো পাওয়া যাবে। আবার এও চিন্তা করে ভালো চাকরি পেলে কেউ হয়তো তখন আর তার রেস্তোরাঁয় আসবেনা। তবু বিশ্বাস করে কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে তার খদ্দেররা তাকে ভুলে যাবেনা, কারণ তাদের দুর্দিনে সে বাকিতে খাইয়েছে সবাইকে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে খোদাবক্স চরিত্রটি কিছুটা অবাস্তব মনে হলেও পাঠকহৃদয়কে আকৃষ্ট করে।

১৯৫৮-৭০ কালপর্বে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর্থ-সামাজিক - রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনে এক গভীরতর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। শ্রেণীশোষণ, জাতি শোষণ আর ধর্মশোষণ শাহরিক মধ্যবিত্ত জীবন ও মানসে যে ধ্বংস ও অবক্ষয়ের সৃষ্টি করেছে *বরফ গলা নদী* সেই সমাজ বাস্তবতারই শিল্পরূপ।

আর কত দিন (১৯৭০)

জহির রায়হানের অসম্পূর্ণ চলচ্চিত্র *লেট দেয়ার বি লাইট* এর কথারূপ *আর কত দিন*।[৬২] বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ ঔপন্যাসিকের-সার্বজনীন জীবনচেতনার প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে। উপনিবেশ শৃঙ্খলিত বিপর্যস্ত যুগপরিবেশ আর সংক্ষুব্ধ সমাজ-বাস্তবতায় দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে এই উপন্যাসে জহির রায়হান হয়েছেন বিশ্বচারী। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়স্বরূপ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতি নির্বিশেষে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীব্যাপী যে ধ্বংস আর নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে *আর কত দিন* তারই শিল্পিত প্রতিবাদ। শাশ্বত ও সার্বজনীন মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ

জহির রায়হান উপন্যাসের শুরুতেই মানুষের এই দীনতা ও সংকীর্ণতার দিকটি তুলে ধরেছেন-

... মানুষ মানুষকে হত্যা করে।
ধর্মের নামে।
বর্ণের নামে।
জাতীয়তার নামে।
সংস্কৃতির নামে।
এই বর্বরতাই অনাদিকাল ধরে আমাদের এই পৃথিবীর শান্তিকে বিপন্ন করেছে।
হিংসার এই বিষ লক্ষ-কোটি মানবসন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।
জীবনকে জানবার আগে।
বুঝবার আগে।
উপভোগ করবার আগে।
ঘৃণার আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষ করেছে অসংখ্য প্রাণ।[৬৩]

মনুষ্যত্ববোধহীন মানুষের এই বর্বরতা, পৈশাচিকতা সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে দীর্ণ, রক্তাক্ত, কলঙ্কিত। তবুও মানুষ বাঁচতে চায়। বৈরী প্রতিকূল পরিবেশের অন্ধকার পথ ধরে এগিয়ে যায় আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে। চিরন্তন এই মানব আর্তি ঔপন্যাসিকের সদর্থক জীবন-অভীপ্সায় হয়ে উঠেছে আলোকোজ্জ্বল উৎসমুখী-

মানুষ মরতে চায় না।
--- বাঁচতে চায়।
এই বাঁচার আগ্রহ নিয়েই গুহামানব তার গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।
সমুদ্র সাঁতরেছে।
পাহাড় পর্বত পেরিয়েছে।
ইতিহাসের এক দীর্ঘ যন্ত্রণাময় পক্ষ পেরিয়ে সেই গুহা-মানব এগিয়ে এসেছে অন্ধকার থেকে আলোতে।
বর্বরতা থেকে সভ্যতার পথে।
মানুষের এ এক চিরন্তন যাত্রা।
জ্ঞানের জন্যে।
আলোর জন্যে ।
সুখের জন্যে।[৬৪]

আলোকসন্ধানী মানুষের এই যাত্রাকে উপন্যাসে লেখক উপস্থাপন করেছেন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে। উপন্যাসের চরিত্র-পাত্ররা তাই কোন একটি নির্দিষ্ট দেশ-কাল-সমাজের প্রতিনিধি না হয়ে বিপন্ন বিশ্বমানবতার রক্তিম প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভয়াল দানবীয় ধ্বংসযজ্ঞের মাঝে আলোকসন্ধানী কথাশিল্পী জহির রায়হান ইতিবাচক জীবনচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থাপন করেছেন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইভা আর তপুকে। 'ঔপন্যাসিকের মানস-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তপু কিংবা ইভা দানবীয় সভ্যতার পাশব অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করেছে এবং সেই আলোর বৃত্ত স্পর্শ করার পূর্বে তাদের

অভিজ্ঞতায়, স্মৃতিতে, অনুধ্যানে অনুপ্রবিষ্ট ঔপন্যাসিক বিশ্ববিহার করেছেন'।[৬৫]

> ... অফুরন্ত মিছিলের একজন বললো। ওরা আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে হিরোশিমায়। আমার মাকে খুন করেছে জেরুজালেমের রাস্তায়। আমার বোনটা একটা সাদা কুত্তার বাড়িতে বাঁদি ছিলো। তার প্রভু তাকে ধর্ষণ করে মেরেছে আফ্রিকাতে। আমার বাবাকে হত্যা করেছে ভিয়েতনামে। আর আমার ভাই, তাকে ফাঁসে ঝুলিয়ে মেরেছে ওরা। কারণ সে মানুষকে ভীষণ ভালবাসতো।[৬৬]

অন্ধকার থেকে আলোর পথে ধাবমান মুক্তি-প্রত্যাশী জনতার মিছিলে জনৈকের এই উচ্চারণের মাঝেই মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জহির রায়হানের সার্বজনীন জীবনচেতনার মৌল সূত্রটি নিহিত।

মৃত্যুভয়ে ভীত তপু-ইভাকে খুঁজে পেয়েছিল হিংস্র পাশবিক এক ভয়াল পরিবেশে। দানবরা হত্যা করেছে ইভার বাবা, মা আর ছোট ভাইটিকে। এই দানবীয়তার মাঝেও ভালবাসার অঃনিশেষ প্রেরণা তপু-ইভার জীবনে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করে। ভবিষ্যত সুখ-স্বপ্নের সম্ভাবনায় মৃত্যুকে পেছনে ফেলে তপু-ইভা ছুটে চলেছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে-

> পালাচ্ছে ওরা।
> দীর্ঘ পথ চলায় ওরা ক্লান্ত। বিবর্ণ বিধ্বস্ত।
> তবু জীবনের জন্যে।
> বাঁচার জন্যে।
> সুখের জন্যে।
> ওরা ছুটছে।[৬৭]

মানবতার শক্তিকে বুকে ধারণ করে ইভা-তপু পরম ভালবাসায় বুকে তুলে নিয়েছে মৃতপ্রায় চার-পাঁচ বছরের আহত ছেলেটিকে আর কচি শিশুটিকে। এই জীবনবোধের বিপরীত আরেকটি চিত্র রূপাঙ্কিত হয়েছে অন্যত্র। মৃত্যুভয়ে ভীত উনিশজন মানুষ আশ্রয় নিয়েছে তপুদের বাড়ীতে। ধ্বংসস্তূপের মাঝে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনছে উনিশজন মানুষ। ব্যক্তি-অস্তিত্ব যেখানে সংকটাপন্ন আরেকটি জীবন সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত, অভিশাপস্বরূপ; স্বার্থপরতার কাছে পরাজয় ঘটে মানবিক মূল্যবোধের। অন্ধকার মাতৃজঠর ছেড়ে যে শিশুটি জন্ম নিল পৃথিবীর বুকে, দু'চোখ ভরে পৃথিবীর আলোকে দেখবার আগেই সে প্রত্যক্ষ করল মানুষের বর্বরতাকে, হিংস্র পাশবিকতাকে। অবরুদ্ধ পদদলিত মানবাত্মার এই কদর্য রূপটি লেখকের আবেগস্পর্শী বর্ণনায় হয়ে উঠেছে হৃদয়বিদারক, অশ্রুসজল-

> বাক্সঘরে তখন কবরের নীরবতা।
> মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলো ওরা।
> ভয়ে।
> আতঙ্কে।

> আর সেই মুহূর্তে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাটির প্রসব-বেদনা উঠেছে। একটি সন্তানের জন্ম দিচ্ছে সে।
> *উনিশজন মৃতপ্রায় মানুষ চরম উৎকণ্ঠার সঙ্গে শিশুটির জন্ম প্রতিরোধের* আপ্রাণ চেষ্টা করছে।
> না। না। এখন নয়।
> এখন নয়।
> মুমূর্ষু মহিলাটি যন্ত্রণার অস্থিরতায় বারবার নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছে আর ঘর্মাক্ত দেহটাকে আয়ত্তে আনার আপ্রাণ চেষ্ট করছে।
> সেও চায়না এ মুহূর্তে শিশুটির জন্ম হোক। কিন্তু! সবাইকে হতাশ করে দিয়ে উনিশজন মানুষের অভিসম্পাত কুড়োতে কুড়োতে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলো।
> আর সঙ্গে সঙ্গে, দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে, উনিশ জনের একজন সেই বাচ্চাটির গলা টিপে ধরলো।
> নিচে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।[৬৮]

যে আলোকোজ্জ্বল জীবনের প্রত্যাশা আর স্বপ্ন বুকে নিয়ে অন্ধকারের পথ পাড়ি দিয়ে তপু- ইভা ছুটে এসেছে স্বজনদের কাছে সেখানেও তারা প্রত্যক্ষ করলো মানুষের আদিম হিংস্র, বর্বরতাকে-

> বুড়িমায়ের হাতজোড়া রক্তাক্ত। যেন এই একটু আগে একসমুদ্র রক্তের মধ্যে হাতজোড়া ডুবিয়ে এসেছেন তিনি।
> বাবার হাতে একটা চকচকে দা। দা-র ডগা থেকে তাজা রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে।
> ভাইদের হাতে লোহার শিক। তাজা খুনে ভরা।[৬৯]

বুড়ি মায়ের আলিঙ্গন থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় তপু। অতঃপর আবারও পথ চলা, অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে বাচ্চা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ইভা -তপু এগিয়ে চলে সামনের দিকে।

> তারপর সমুদ্রের পাড় ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো ওরা। সামনে।[৭০]

সভ্যতার অন্ধকারে মানুষের দানবীয় হিংস্রতা থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় আলোকোজ্জ্বল জীবনের লক্ষ্যে ধাবমান জনতার মিছিলে তপু-ইভার পথচলার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে *আর কত দিন* উপন্যাসের কাহিনী। মিছিলের মাঝে তপু-ইভার সার্বজনীন আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের বিশ্বজনীন মানবিকতাবোধ -

> *আমরা কোথায়?*
> ভিয়েতনামে না ইন্দোনেশিয়ায়।
> জেরুজালেমে না সাইপ্রাসে।
> ভারতে না পাকিস্তানে
> কোথায় আমরা?[৭০]

আইউবের সামরিক শাসনের বন্দী প্রতিবেশে প্রতিবাদী কথাশিল্পী জহির রায়হান *আর কত দিন* উপন্যাসের ঘটনাংশকে বিন্যস্ত করেছেন বিশ্বব্যাপী অবরুদ্ধ পদদলিত মানবাত্মার প্রেক্ষাপটে। সামাজ্যবাদী শক্তির জাতিশোষণ, শ্রেণীশোষণ আর সাম্প্রদায়িক শোষণের বিরুদ্ধে সার্বজনীন মানবাত্মার চিরন্তন প্রতিবাদ আলোচ্য উপন্যাসকে গৌরবজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও *আর কত দিন* জহির রায়হানের শিল্পসার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। *আরেক ফাল্গুনে*'র মত এই উপন্যাসেও পরিচ্ছেদ বিভাজন এবং ঘটনাবলীর উপস্থাপনে যথারীতি ফেড ইন ও ফেড-আউট এবং কাট-টু-কাট পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। ছোট ছোট বাক্যের চিত্রকল্পাত্মক বর্ণনারীতি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত -

> অন্ধকারের নিচে সমাহিত মৃত নগরী।
> প্রাণহীন।
> যেন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত তার অবয়ব।
> দীর্ঘ প্রশস্ত পথগুলোতে কবরের শূন্যতা।
> ভাঙা কাচের টুকরো। ইটের টুকরো। আর মৃতদেহ।
> কুকুরের।
> বিড়ালের।
> পাখির।
> আর মানুষের।
> একটা।
> দুটো।
> তিনটে।
> অগুনতি।[৭১]

জহির রায়হানের প্রত্যেকটি উপন্যাসে শিল্পের চেয়ে জীবনই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষত বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনচিত্র নির্মাণে তিনি যে দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তা একটি মাইলস্টোন স্বরূপ। কোন রূপকের আশ্রয় না নিয়ে জীবন যেমন ঠিক তেমনিভাবেই তিনি তা উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত নির্মোহভাবে। সেখানে নেই কোন উচ্ছ্বাস, বাহুল্য বা অকারণ বাড়িয়ে বলা। জীবনের সম্ভাবনাকে যেমন তিনি দেখিয়েছেন, তেমনি তার সংকীর্ণতাকেও অস্বীকার করেননি। ভালো-মন্দ, দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা সবকিছু মিলিয়ে জীবনের সমগ্র রূপটিই তাঁর অন্বিষ্ট ছিল। এই জীবনঘনিষ্ঠতাই জহির রায়হানকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গঃ বাংলা কথাসাহিত্য*, 'উপন্যাস বিচারের ভূমিকা', অক্টোবর ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৬৯-৭০।

২। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, জুন ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৪।

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫-৪৬।

৫। বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ১৫

৬। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬০।

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০।

৮। *শেষ বিকেলের মেয়ে, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান*, (সম্পাদক : ড. মোহম্মদ হান্নান, আরজুমন্দ আরা রানু) ১৯৯৮, পৃ. ২১।

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২।

১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।

১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

১৬। *তৃষ্ণা, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান* (সম্পাদক : ড. মোহম্মদ হান্নান, আরজুমন্দ আরা রানু) পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০।

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

১৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।

২০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১।

২১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮।

২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

২৩। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১২১।

২৪। *হাজার বছর ধরে*, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান, পাদটীকা নং-৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০।

২৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০।

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫।

২৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬।

২৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২।

৩০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০।

৩১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।

৩২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০।

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯।

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১।
৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪-৯৫।
৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০।
৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬।
৩৮। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১২১।
৩৯। *হাজার বছর ধরে*, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান, পাদটীকা নং ৮, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৮।
৪০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫।
৪১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬।
৪২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২।
৪৩। *আরেক ফাল্গুন*, উপন্যাস সমগ্র, জহির রায়হান, পাদটীকা নং ৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯
৪৪। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৭।
৪৫। *আরেক ফাল্গুন*, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩।
৪৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১-৪২।
৪৭। মুহম্মদ ইদরিস আলী, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, ফাল্গুন ১৩৯১, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৪৯।
৪৮। *আরেক ফাল্গুন*, জহির রায়হান উপন্যাস সমগ্র, পাদটীকা নং ৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭
৪৯। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭।
৫০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭।
৫১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮।
৫২। *আরেক ফাল্গুন*, জহির রায়হান উপন্যাস সমগ্র, পাদটীকা নং ৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
৫৩। *বরফ গলা নদী*, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান, পাদটীকা নং ৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১-৭২।
৫৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮-৮৯।
৫৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০।
৫৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩।
৫৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২।
৫৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০।
৫৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬।
৬০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯।
৬১। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮।
৬২। শাহরিয়ার কবির, ভূমিকা, *একুশে ফেব্রুয়ারী, জহির রায়হান*, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ১৪।
৬৩। *আর কত দিন*, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান (সম্পাদক ঃ ড. মোহম্মদ হান্নান, আরজুমন্দ আরা রানু), ১৯৯৮, পৃ. ৩৫৫।
৬৪। *আর কতদিন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫৫।

৬৫। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৮৯।

৬৬। *আর কত দিন*, উপন্যাসসমগ্র, জহির রায়হান, পাদটীকা নং ৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১।

৬৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬।

৬৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫-৬৬।

৬৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩।

৭০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪।

৭১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪।

৭২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫-৫৬।

তৃতীয় অধ্যায়

জহির রায়হানের ছোটগল্প : সমাজ ও রাজনীতি

তৃতীয় অধ্যায়

জহির রায়হানের ছোটগল্প : সমাজ ও রাজনীতি

উপন্যাসের মত ছোটগল্পও কথাসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা। রেনেসাঁস-উত্তর বিকশিত পুঁজিবাদি সমাজব্যবস্থায় সমাজজীবনের বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য এবং সীমাহীন জটিলতার ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কথাসাহিত্যে ছোটগল্পের দীপ্র আবির্ভাব। জীবনের সমগ্ররূপের বিপরীতে খণ্ডিত রূপাংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে ছোটগল্পের কথা-পরিসর। বলাবাহুল্য উপন্যাসের মত ছোটগল্পের ভিতও রচিত হয়েছে ইউরোপে। আর বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরেই ছোটগল্পের যাত্রা শুরু। অন্যদিকে বিশ শতকের ঢাকাকেন্দ্রিক নববিকশিত 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনাস্নাত কয়েকজন শিল্পীর সাধনায় রচিত হয়েছে বাংলাদেশের ছোটগল্প সাহিত্যের প্রাথমিক ভিত্তি।'[১]

সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের ছোটগল্পে দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, এক — সামন্ত মূল্যবোধে বিশ্বাস, দুই — বুর্জোয়া মানবতাবাদে আস্থা। ১৯৪৭-৫৭ কালপরিসরে রচিত ছোটগল্পের বিষয় নির্বাচনে কথাসাহিত্যিকরা প্রধানত গ্রামজীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ১৯৫৮ পরবর্তী বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবন বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর কারণ সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে নিহিত। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন ও শোষণ, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অবাঙালি পুঁজির বিকাশ; অন্যপক্ষে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জনজীবনকে অস্থির করে তোলে। সংক্ষুব্ধ জনমানসের প্রেক্ষাপটে কল্লোলিত অস্থির সময় একালের ছোটগল্পকে করেছে ব্যঞ্জনাধর্মী। এপর্বের ছোটগল্পেও দুটি ধারা লক্ষণীয়। একদিকে জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে শঙ্কিত, আপোষকামী শিল্পীচৈতন্য। অন্যদিকে সত্যসন্ধানী, সংরক্ত সমকালস্পর্শী প্রগতিশীল শিল্পীচৈতন্য- বিপর্যস্ত যুগপরিবেশে বাস করেও যাঁরা 'সমকালচঞ্চল জীবনাবেগ, যুগসংক্ষোভ এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-দ্রোহ' অঙ্গীকারকল্পে সমাজ-প্রগতির আলোকবর্তিকা জ্বালিয়েছেন।[২]

বাংলাদেশের ছোটগল্পের জগতে জহির রায়হানের আবির্ভাব পঞ্চাশের দশকে হলেও ষাটের দশকের অবরুদ্ধ সমাজজীবন তাঁর গল্পে একটি ভিন্ন

মাত্রা সংযোজন করেছে। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে বিপর্যস্ত গ্রামজীবন আর নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও হৃদয়রহস্য নিয়ে গড়ে উঠেছে জহির রায়হানের গল্পভুবন। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রেরণাউৎস ছিল বায়ান্নর রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলন। সামসময়িক লেখক শিল্পীদের মধ্যে জহির রায়হানই রাজনীতির প্রতি সবচেয়ে বেশি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে জহির রায়হানের সাহিত্য জীবনের সূচনা হলেও উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যেই তাঁর শিল্পিসত্তা সামগ্রিক সিদ্ধি অর্জন করেছে। 'ভাষা ব্যবহার এবং প্রকরণ প্রসাধনে জহির রায়হান পরীক্ষাপ্রিয় কথাকার। তাঁর গল্প-আঙ্গিক চিত্রনাট্যধর্মী, সংহত এবং কবিতাস্নিগ্ধ।'[৩] মানবজীবনের গভীরতর রহস্য উন্মোচন জহির রায়হানের গল্পগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বক্তব্যের অতিকথন এবং অতিনাটকীয়তা কখনো কখনো গল্পগুলোর শৈল্পিক সিদ্ধি অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও বাংলাদেশের ছোটগল্পের ইতিহাসে জহির রায়হান তাঁর জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড[৪] শীর্ষক গ্রন্থটি আমরা জহির রায়হানের গল্পগুলো আলোচনার জন্য টেকস্ট হিসেবে গ্রহণ করেছি। এই গ্রন্থে *একুশে ফেব্রুয়ারী* সহ মোট উনিশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। সে হিসেবে মোট উনিশটি গল্পের আলোকে জহির রায়হানের সমাজ ও রাজনীতি চেতনাকে বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আলোচনার সুবিধার্থে গল্পগুলোকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

১.

প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলোর মধ্যে জহির রায়হানের অপরিণত শিল্পীসত্তার পরিচয় লক্ষণীয়। এর কারণ লেখকের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা। পরবর্তীতে লেখক তাঁর এই দুর্বলতাকে অনেকাংশেই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন।

হারানো বলয় জহির রায়হানের প্রথম গল্প। 'একদা উচ্চবিত্তের স্বপ্নপ্রত্যাশী এবং গার্হস্থ্য জীবনে নারীর মুক্তিতত্ত্বে বিশ্বাসী কলেজছাত্রী আরজু কিভাবে আদর্শের মধ্যে পরবর্তী জীবনের সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করেছে গল্পটি তারই ইতিবৃত্ত'।[৫] আরজু-আলম একই কলেজে পড়াশুনা করতো, দুজনে দুজনকে পছন্দ করতো, কল্পনায় স্বপ্নের জাল বুনতো। একটা সুখী, সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতো আরজু, ছোট্ট ছিমছাম একটা সংসার আর কোল জুড়ে সুন্দর ফুটফুটে একটা ছেলে। আরজু বিশ্বাস করতো 'সংসার বাঁধাটাই নারীর ধর্ম।'[৬] সব সময়ে পরিপাটি আরজু গহনা পড়তেও খুব ভালবাসতো -

> অলঙ্কার পরার একটা প্রবল ঝোঁক ছিল ওর। সেবার স্কলারশিপের টাকাগুলো হাতে আসতেই আলমকে বললো-চলো সরকারের দোকানে যাবো একটু। পুরোন চুড়ি আছে দুটো। ভালো লাগেনা আর- সেকেলে সেকেলে দেখতে। ওগুলো বিক্রি করে নতুন প্যাটার্ণের একজোড়া কিনে আনবো।[৭]

আলম চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত কেরানী জীবনের টানাপোড়েনের চিত্র ফুটে উঠেছে। বাস্তবের কঠিন নিষ্পেষণে আরজু-আলম আজ তাদের রোমান্টিকতার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য অভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় আজ দুজনেই ভিন্ন পথের যাত্রী। অথচ একদিন আলম আরজুর হাতে বালা পড়িয়ে দিতে আরজু বলেছিল -

> ... যদি কোনদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় কিংবা যদি একটা গাঢ় অন্ধকারের ভেতরে ডুবে যাই আমরা, তখন এ সুন্দর চকচকে পাথরগুলো আলোর সৃষ্টি করে পথ দেখাবে আমাদের। অন্ধকারে হারিয়ে যাবার ভয় থাকবেনা।[৮]

আর আজ জীবনযুদ্ধে পরাজিত আলমের রাস্তায় দাঁড়িয়ে-

> ... হঠাৎ আরজুর কথা মনে পড়ে গেলো তার। যদি পথের ভেতর দেখা হয়ে যায় ওর সাথে। আর ও যদি আজ হাত পেতে বসে আলমের কাছে তাহলে? চলার গতিটা আরো একটু বাড়িয়ে দিলো আলম।[৯]

এ গল্পের আরেকটি চরিত্র মুনির — আরজুর বড় ভাই যে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে কারাবন্দী। বাবা-মা, ভাই-বোনের চেয়ে দেশই তার কাছে বড়। সবরকম সাংসারিক বন্ধনকে অস্বীকার করে দেশের মুক্তির জন্য রাজনীতির পথকে বেছে নিয়েছে মুনির। আরজু-আলমের সম্পর্ককে কখনো স্বভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি মুনির-

> প্রেমে ফ্রেমে বিশ্বাস করিনা আমি। মুনির ধমক দিল আরজুকে-ওসব ছেলেমানুষি ছেড়ে দে। চাকরি করে ছোট ভাইবোনগুলোকে মানুষ করতে হবে তোকে, তা ভুলে যাসনে।[১০]

মুনিরের জীবনাচরণ আলমের কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও একধরনের শ্রদ্ধাবোধও কাজ করতো তার প্রতি। এই শ্রদ্ধাবোধ থেকেই আরজুর কাছে মুনিরের খবরাখবর নিতো। অন্যদিকে মুনিরের অনুপস্থিতিতে সংসারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার রাজনৈতিক আদর্শবোধেও উজ্জীবিত হয় আরজু। গল্পটির সমাপ্তিতে দেখি খোলা রাস্তায় আপত্তিকর রাজনৈতিক প্রচারপত্র বিলি করার অপরাধে পুলিশের হাতে ধৃত হয় আরজু। আরজুর হাতকড়াটা আলমের কাছে মনে হোল হারিয়ে যাওয়া সেই বালা দুটো- যা অন্ধকারে পথ দেখায়-

> ...বৈকালীন সূর্যের রক্তিম আভা তির্যকভাবে গড়িয়ে পড়ছে আরজুর হাতের হাতকড়াটার ওপর আর কেমন চক্‌চক করছে ওটা। যেন ওর হারানো বালা দুটো। হঠাৎ মনে পড়লো আলমের। আরজু বলেছিলো ওর বালা অন্ধকারে পথ দেখায়।[১১]

১৯৫২- এর মহান ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত *সূর্যগ্রহণ* জহির রায়হানের প্রথম পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র জহির রায়হানই ভাষা আন্দোলনের উপর একাধিক গল্প উপন্যাস লিখেছেন। একুশের আত্মদান জহির রায়হানের চেতনামূলে প্রোথিত ছিল। *সূর্যগ্রহণ* গল্পের ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত হয়েছে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আনোয়ার সাহেবের দৃষ্টিকোণ থেকে।

আনোয়ার সাহেব সামান্য বেতনের একজন চাকুরীজীবী, চাকরির পাশাপাশি তিনি টিউশনি করেন বাড়তি কিছু উপার্জনের জন্য। আনোয়ার সাহেবের মেসমেট তসলীমও স্বল্প আয়ের চাকুরীজীবী। গ্রামের বাড়ীতে মা, বোন আর স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়ে দেয়। কবিতা লেখা ছিল তার একমাত্র নেশা। তার কবিতার প্রথম শ্রোতা এবং সমালোচক ছিলেন আনোয়ার সাহেব। নতুন কোন কবিতা লিখে জোড় কারে আনোয়ার সাহেবকে শোনাতো তসলীম-

> হাত নেড়ে নেড়ে পড়তো তসলীম। পড়তো না ঠিক যেন অভিনয় করতো সে।
> পড়া শেষ হলে যদি বলতেন ভালো হয়েছে। তা হলে খুব খুশি হতো তসলীম। আর যদি বলতেন কেমন যেন ভাল লাগলো না আমার। তা হলে মুখ কালো করে বলতো সে, কবিতা বোঝেনই না আপনি।
> আনোয়ার সাহেব হাসতেন। কিছু বলতেন না।[১২]

এমনি করে স্বভাব ঔদাসীন্যে কেটে যেতো হাসিখুশি তসলীমের দিনগুলো। সেই জীবনপটে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে তসলীমের আকস্মিক মৃত্যুতে। ১৯৫২- ভাষার দাবীতে মিছিলে আর শ্লোগানে উন্মাতাল সারা শহর। মাতৃভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একাত্ম হয়েছে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা। অধিকার আদায়ের এই লড়াইয়ে তসলীমও সামিল হয়েছে সংগ্রামী ছাত্রসমাজের সাথে। আনোয়ার সাহেব নানা ভাবে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে তসলীমকে। উত্তরে তসলীম বলেছে-

> ... আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?[১৩]

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র জনতাকে দমন করতে পাকিস্তানী সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। দমননীতি সত্ত্বেও সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ছাত্রদের ঠেকাতে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারীও পুলিশ ছাত্রজনতার উপর গুলি চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে একুশে ফেব্রুয়ারী সারারাত জেগে অসংখ্য পোস্টার লিখেছে তসলীম। পরদিন শোষকের সেই গুলি তসলীমের বুকেও যে বিদ্ধ হবে আনোয়ার সাহেব ঘূর্ণাক্ষরেও তা বুঝতে পারেননি। তসলীমের মৃত্যুর পর তার পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন আনোয়ার সাহেব। এ দায়িত্ব তার উপর কেউ জোড়

করে আরোপ করেনি। নিজের আন্তর গরজেই এ ভার তিনি গ্রহণ করেছেন। এরপর দীর্ঘ একবছর তসলীমের মৃত্যুসংবাদ গোপন রেখে প্রতি মাসের খরচ তিনি পাঠিয়েছেন তসলীমের বিধবা স্ত্রী হাসিনার কাছে। একবছরে হাসিনাও কম চিঠি লেখেনি তসলীমকে। প্রতিটি চিঠিই সযত্নে রেখে দিয়েছেন আনোয়ার সাহেব। হাসিনার বিরহ-কাতরতা আনোয়ার সাহেবের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেবল বাড়িয়েই তুলেছে-

> সারা রাত জেগে শুধু ভেবেছেন তিনি তসলীমের মৃত্যু খবরটা কি জানাবেন হাসিনাকে? চিঠি লিখে কি জানিয়ে দেবেন ওদের যে তসলীম মারা গেছে? ওদের পরিবারের একমাত্র উপর্জনক্ষম লোকটা আর বেঁচে নেই।[১৪]

হাসিনার প্রতিটি চিঠি তসলীমের কথা তাকে আরো বেশি করে মনে করিয়ে দিয়েছে-

> প্রতিদিন, যখনি হাসিনার চিঠি এসেছে তখনই তসলীমকে মনে পড়েছে আনোয়ার সাহেবের। বড্ড বেশি করে মনে পড়েছে যেন। রোগা লিকলিকে ছেলেটার কথা বারবার করে চোখের ওপর ভেসে উঠেছে তার।
>
> বড্ড বেশি কথা বলতে পারতো তসলীম। যতক্ষণ ঘরে থাকতো, ঘরটাকে সরগরম রাখতো সে।[১৫]

দীর্ঘ একবছরে এই পরিবারটির সঙ্গে তিনি যেন এক অজানা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তাই তসলীমের মৃত্যুর পর জন্ম নেয়া মেয়েটাকে দেখার জন্য তার মন কেমন করে ওঠে। এই হৃদয়দৌর্বল্যের কারণেই আনোয়ার সাহেব তসলীমের মৃত্যুসংবাদকে এতদিন ধরে গোপন রেখেছেন। বহুবার ভেবেছেন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তি নিবেন, ভুলে যাবেন সবকিছু-

> ... মানু মিনু সবাইকে ভুলে যেতে চান তিনি। ভুলে যেতে চান হাসিনাকে। আম্মাকে। সবাইকে। গোটা পরিবারটাকে। তবু, ভুলতে পারেন কই আনোয়ার সাহেব? যত ভাবেন সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে দেবেন। তত যেন মনের ভেতর আরো বেশি করে শিকড় গাড়ছে ওরা। সারাদিন ওদের কথাই শুধু ভাবেন আনোয়ার সাহেব।[১৬]

আনোয়ার সাহেবের এই মানসিকতা সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে। কেননা তসলীমের পরিবারের প্রতি তার পরহিতৈষণা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করা গেলেও জীবনবোধের প্রশ্নে, লৌকিক আচারধর্মের মানদণ্ডে তা অস্বাভাবিক এবং অতিনাটকীয় মনে হয়।[১৭] দেরীতে হলেও বিষয়টি আনোয়ার সাহেবও উপলব্ধি করেছেন। আর তাই দীর্ঘ একবছর পর তার মনে হয়েছে 'এ প্রহসন আর কতদিন চালাবেন তিনি।'[১৮] তৎসত্ত্বেও আনোয়ার সাহেবের চরিত্রের মানবিক মূল্যবোধ-সঞ্জাত দিকটি পাঠকহৃদয়কে আকৃষ্ট করে। আনোয়ার সাহেবের অন্তর্জাগতিক টানাপোড়েনের চিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে

লেখক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন *সুর্যগ্রহণ* গল্পে।

'আমি' নামক উত্তম পুরুষে টুনুর সংগ্রামশীল জীবনকাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে *ভাঙাচোরা* গল্পে। স্কুলে পড়া অবস্থায় কিশোরী টুনু ঘর ছেড়েছিল একটা ননমেট্রিক ছেলের হাত ধরে। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত টুনু জীবনসংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করেনি, বরং সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছে। ছোট্ট এক মফ:স্বল শহরে স্বামী আর চার সন্তান নিয়ে টুনুর সংসার। স্বামী স্থানীয় পোস্ট অফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় পিয়নের চাকরি করে। অফিস ছুটির পর রাতে শহরের রাস্তায় রিকশা চালায় বাড়তি আয়ের জন্য। অন্যদিকে টুনু স্বামীর অগোচরে পি.ডব্লিউ. ডি.'র মেসে মাসিক ২০ টাকায় রাঁধুনির কাজ করে। টুনু এবং তার স্বামী দুজনেই নিষ্ঠা এবং কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে চেয়েছে। লেখক টুনু এবং তার স্বামীর জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেনীর মানুষের জীবনকাহিনীকে তুলে ধরেছেন। সমাজে এরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে পরিচিত। খেটে খাওয়া এই সাধারণ মানুষগুলো কর্মের মাঝেই খুঁজে পায় জীবনের সফলতার উৎস।

ভাঙাচোরা গল্পের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে প্রান্তিক চরিত্র সালামের দৃষ্টিকোণ থেকে। সালাম একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। সরকারী কাজে সে টুনুদের মফঃস্বল শহরে এসেছে। এখানে টুনুর সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটে দীর্ঘ আটবছর পর -

> ... এ ক'বছরে অনেক বদলে গেছে টুনু। সেদিনের সেই তন্বী মেয়েটি আর নেই। ফর্সা রংটা তামাটে হয়ে গেছে। গোলগাল চেহারাটা গেছে ভেঙ্গে। কানের কাছে দু-একটা চুলে পাকও ধরেছে টুনুর। [১৯]

টুনুর বাড়ীতে এসে সালামের পরিচয় ঘটে দারিদ্র্যপীড়িত টুনুর সংসারজীবনের সঙ্গে। বিস্ময়ও কম হয়েনি টুনুর স্বামীকে দেখে-

> টুনুর স্বামীকে দেখে এমনভাবে চমকাতে হবে তা কে জানতো।
>
> তবু চমকালাম, ভীষণভাবেই চমকে উঠলাম হয়তো। পরনে একটা খাটো করে পরা লুঙ্গি, গায়ে একটা ময়লা চাদর জড়ানো। পায়ে একজোড়া মোটর টায়ারের স্যাণ্ডেল। লোকটাকে চিনতে একটুও ভুল হলোনা। সেও চিনলো আমায়। আর, চিনলো বলেইতো মুখখানা কেমন ফেকাশে হয়ে গেলো তার।[২০]

শিল্প-বিচারে *ভাঙাচোরা* অসঙ্গতিপূর্ণ, কেননা যে যুক্তিজ্ঞান ও স্বাভাবিকতাবোধ একটি বিষয়কে বাস্তবানুগ করে তুলতে পারে তা এই গল্পে অনুপস্থিত। টুনুর দাম্পত্যজীবনের যে চিত্র লেখক এঁকেছেন তাও অসঙ্গতিপূর্ণ। কেননা সাংসারিক স্বচ্ছলতার জন্য স্বামী-স্ত্রীর গোপন কর্মকাণ্ড

একটি ছোট মফঃস্বল শহরের প্রেক্ষাপটে অস্বাভাবিক মনে হয়। আত্মসম্মানবোধের ব্যাপারটিও কেমন যেন অতিনাটকীয় মনে হয়। লেখকের অপরিণত শিল্পী-মানস এই ব্যর্থতার কারণ। এছাড়া প্রান্তিক চরিত্র সালামের দৃষ্টিকোণ থেকেও অভিজ্ঞতার আলোকে বিন্যস্ত টুনুর জীবনসংঘর্ষও ততটা বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠেনি লেখকের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার কারণে। টুনুর জীবনের সমগ্রতাকে ফুটিয়ে তুলতে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন একথা সত্য, তথাপি *সূর্যগ্রহণ* এর মতো এই গল্পেও লেখকের সময়জ্ঞান ও সমাজ-সচেতনতার পরিচয় মেলে। দুটি গল্পেরই কাহিনী ও ঘটনাক্রম একটি নির্দিষ্ট সময় ও প্রেক্ষাপটে শিল্পিত হয়েছে। টুনু, টুনুর স্বামী এবং প্রান্তিক চরিত্র সালামের পাশাপাশি তুলির আচড়ে বুড়ো দাদি এবং ডাকবাংলোর পিয়নের মতো লেখক এমন কিছু পূর্ণ ও জীবন্ত লোকচরিত্র নির্মাণ করেছেন যেখানে তাঁর ছোটগাল্পিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় মেলে। লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ক্রমপরিণতিও লক্ষণীয়-

> ... সামনের ছোট্ট কেরোসিন বাতিটার ওপর নির্ভর করেই চলে রিক্সা। দোকানপাটগুলো খোলা থাকলে তবু কিছু আলো আসে রাস্তায়। কিন্তু এ পৌণে বারোটায় দোকানপাট বন্ধ করে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার মালিকরা। লোকজন কারো সাড়াশব্দ নেই। শুধু দু একটা হ্যাংলা কুকুর মাঝে মাঝে চিৎকার করছে এখানে ওখানে।[২১]

পরিণত শিক্ষাবোধ ও প্রাগ্রসর জীবনচেতনার পরিচয়বাহী *বাঁধ নয়াপত্তন, ম্যাসাকার, অপরাধ* এবং *অতি-পরিচিত* প্রভৃতি গল্প। অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকায়ত মানুষের অস্তিত্বসাধনা এবং জীবনসংগ্রামের গতিশীল রূপ বিন্যস্ত হয়েছে *বাঁধ গল্পে*। ধর্মান্ধতা আর রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ গ্রামীণ জীবন। লোকায়ত মানুষের এই ধর্মভীতিকে আশ্রয় করে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহামানবরূপে। সাধারণ মানুষের কাছে এরা পরিচিতি পায় পীর-দরবেশরূপে। তথাকথিত এই ভণ্ড পীরসমাজ দ্বারা প্রতারিত হয় সরলপ্রাণ গণমানস। বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপটে সমাজসত্যের এই বিশিষ্ট দিকটিকে লেখক তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পে।

পরপর কয়েক বছর বন্যার জলে বাঁধ ভেঙে গাঁয়ের ফসলী ক্ষেতগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের ডাওরে ভেসে যায় চাষীর সোনার ফসল। স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা আর কান্নাকাটি করেও কোন লাভ হয়নি। তাই গ্রামপ্রধান রহিম সর্দার চাষীদের বললেন গফরগাঁও থেকে পীর মনোহার হাজীকে নিয়ে আসার জন্য। তাদের বিশ্বাস পীর সাহেবের দোয়াই পারবে মহাসংকট থেকে তাদেরকে বাঁচাতে। মনোয়ার হাজীর অনেক অলৌকিকত্বের খবর গ্রামবাসী জানে। আর এও জানে টাকা ছাড়া তাকে আনা যাবেনা। খুবই আয়েশী এবং বিলাসী এই পীরসাহেবের জন্য -

> ... বিশেষ ধরনের পাল্‌কি চাই। আট বাহকের পাল্‌কি। ঘি ছাড়া কোন কিছু মুখেই রোচেনা পীর সাহেবের। গোস্ত ছাড়া ভাত খান না। খাবার

> শেষে এক প্রস্থ মিষ্টি না হলে খাওয়াটাই অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তাঁর। তাই টাকার দরকার।[২২]

গ্রামের সকল মানুষ এই দুর্দিনেও চাঁদা তুলে পীর সাহেবকে আনাবার ব্যবস্থা করে, গ্রামবাসী এটুকু বোঝে -

> ... খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। পীর সাহেবের মন গললে এ হতভাগাদের জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা করবেন তিনি। তারপরেই না খোদা মুখ তুলে তাকাবেন ওদের দিকে।[২৩]

এই অজ্ঞ, অন্ধ, সাধারণ মানুষগুলোর মাঝেই রয়েছে যুক্তিবাদী প্রগতিশীল মতি মাস্টার, রয়েছে দৌলত কাজীর মেজ ছেলে রশীদ — যে শহরে থেকে কলেজে লেখাপড়া করে। গ্রামবাসীদের চোখে এরা 'নাফরমান বেদীন'; প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব তাই অনিবার্য।

গল্পের ভণ্ড পীর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণীর পরিচয় ফুটে উঠেছে, যাদের দ্বারা নির্জিত, প্রতারিত হয় গ্রামের সহজ সরল সাধারণ মানুষগুলো। ধর্মীয় বাতাবরণে নিজেদেরকে এরা মহাপুরুষরূপে সকলের কাছে উপস্থাপন করে। আর অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ সাধারণ মানুষও এদের দ্বারা মোহাবিষ্ট হয়ে নানা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। মতি মাস্টারের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন জোয়ান মানুষের সারারাত ব্যাপী অক্লান্ত শ্রমের দ্বারা যে বাঁধ রক্ষা পেল, সকালবেলা গ্রামের সাধারণ মানুষ তাকেই ধরে নিল পীরসাহেবের কেরামতি হিসেবে-

> আধ আলো অন্ধকার আকাশ বেয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মৃদুমন্দ বাতাসের তালে তালে নাচছে সোনালী ফসল। মসজিদ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো জমির বেপারী। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীরসাহেব।
>
> এক মুহূর্ত যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সমস্ত গাঁটা। ছেলে বুড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে খেয়ে আসছে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খাবার জন্যে।[২৪]

আর ঘুমে ঢুলুঢুলু পীরসাহেবের মুখে -

> স্বল্প পরিমিত হাসি আপেলের রক্তিমাভার মতো ফেটে পড়ছে মুখের সর্বত্র।[২৫]

সংঘশক্তিতে বিশ্বাসী জহির রায়হানের অসাধারণ সৃষ্টি *নয়াপত্তন* গল্পে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় একটি ভেঙ্গে পড়া স্কুলের পুনর্গঠনের কাহিনী বিনস্ত হয়েছে। মার্ক্সীয় দর্শনে আস্থাশীল জহির রায়হান এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন শনু পণ্ডিতকে। আর প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছেন

গ্রামজীবনকে। শনু পণ্ডিত গ্রামের একজন গরিব বৃদ্ধ স্কুলমাস্টার। লেখকের ভাষায় - 'ন্যুব্জ দেহ, রুক্ষ চুল, মুখময় বার্ধক্যের জ্যামিতিক রেখা।'[২৬] পঁচিশ বছর আগে গ্রামের জমিদার জুলু চৌধুরীর সহায়তায় শনু পণ্ডিত একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শনু পণ্ডিত তখন বাইশ বছরের টগবগে যুবক, মাত্র এন্ট্রান্স পাশ করেছেন। জমিদার জুলু চৌধুরীর সাথে ওঠাবসা। আশে পাশে দু'চার গাঁয়ে কোন স্কুল ছিলনা। লেখাপড়া কি জিনিস তাই জানতোনা গাঁয়ের মানুষগুলো। অশিক্ষিত মূর্খ এই মানুষগুলোর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে জুলু চৌধুরীর সহায়তায় অনেক স্বপ্ন আর আশা নিয়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শনু পণ্ডিত। পঁচিশ বছর পরে আকস্মিক ঝড়ে যখন স্কুলটি মুখ থুবড়ে পড়ল সরকার, জুলু চৌধুরী কেউই সাহায্যে এগিয়ে এলনা। হতাশ শনু পণ্ডিতকে আশার আলো দেখালো গাঁয়ের সাধারণ মানুষগুলো । একদিন যে আলোকবর্তিকা তিনি সবার মাঝে জ্বালিয়েছিলেন, আজ তারাই জ্বালালো নতুন সৃষ্টি সম্ভাবনার আলো। অবশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্কুলটি আবার গড়ে উঠলো, যেন নবজন্ম হল।

নয়াপত্তন গল্পে লেখক একটি গ্রামের পটে সমস্ত বাংলাদেশের গ্রামীণ চিত্রটিকে তুলে ধরেছেন। বুড়ো হাশমত, তকু শেখ, আমিন বেপারী, তোরাব আলী, আক্রম হাজী, কদম আলী এরা সকলেই আমাদের অতি পরিচিত। গ্রামের এই মানুষগুলো অতি সাধারণ, দরিদ্র, শ্রমজীবী। জুলু চৌধুরীদের মতো জমিদারদের জমি চাষ করে কষ্টেসৃষ্টে জীবন কাটে। অভাব, দারিদ্র্য, যন্ত্রণা যাদের নিত্যসঙ্গী লেখাপড়া সেখানে কল্পনাতীত বিষয়। শিক্ষার কোন মূল্য নেই তাদের কাছে। আমিন বেপারীর কথাতে এর প্রমাণ মেলে -

> ... আর রাইখা দাও লেখাপড়া। আমাগো বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষে কোনদিন লেখাপড়া করে নাই। ক্ষেতের কাজ কইরা খাইছে। আমাগো ছেইলা পেইলারাও তা কইরবো। লেখাপড়ার দরকার নাই।[২৭]

অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই মানুষগুলোর চাওয়া-পাওয়া অতি সামান্য। তিনবেলা খাবার জুটলে আর কিছুই তাদের চাইবার নেই। শনু পণ্ডিতই এই মানুষগুলোর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে ছিলেন, নতুন করে বাঁচার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। তাই সাহায্য না পেয়ে ক্লান্ত, ব্যর্থ পণ্ডিত যখন গাঁয়ে ফিরে এলো গাঁয়ের মানুষগুলো স্বভাবতই আশাহত হয়েছিল। নিজেদের চিন্তায় নয়, ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে -

> বুড়ো হাশমত চুপচাপ কি যেন ভাবছিলো এতক্ষণ। ছেলে দুটো আর বাচ্চা নাতিটাকে অনেক আশা ভরসা নিয়ে স্কুলে দিয়েছিল সে। আশা ছিল আর কিছু না হোক লেখাপড়া শিখে অন্তত কাচারীর পিয়ন হতে পারবে ওরা।[২৮]

পরাধীন, শোষণমূলক ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বৈষম্যমূলক জীবনবিন্যাসের রূপায়ণ - *নয়াপত্তন*। শ্রেণীসচেতন লেখক জহির রায়হান এই গল্পে সমাজের দুটি শ্রেণীকে নির্দেশ করেছেন। একদিকে রয়েছে তকু শেখ,

তোরাব আলী, বুড়ো হাশমত, আমিন বেপারী প্রমুখর মত খেটে খাওয়া সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ যারা সরকার বা জুলু চৌধুরী কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের শ্রম ও সামর্থ্যে আবারো গড়ে তোলে স্কুল গৃহ। অন্যদিকে রয়েছে সরকার ও জুলু চৌধুরীর মতো সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীচরিত্র যারা নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজের নিচুতলার মানুষগুলোকে অধিকারবঞ্চিত করে রাখে। অথচ শোষিত, অবহেলিত আর অধিকারবঞ্চিত এই শ্রমজীবী মানুষের দ্বারাই সুচিত হবে মানবমুক্তির নতুন দিন।

বাঁধ এবং *নয়াপত্তন* দুটি গল্পই সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী জহির রায়হানের সমষ্টিগত জীবনচেতনার বহিঃপ্রকাশ। দুটি গল্পেরই কেন্দ্রীয় বিষয় সম্মিলিত জনশক্তির জয়গান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ক্রমপ্রসারে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক এবং কৃষক সম্প্রদায় ক্রমাগত নিঃস্ব হতে থাকে। নব্য পুঁজিবাদের সুফল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যদিকে শ্রমজীবী শ্রেণীর দারিদ্র্য যেমন ব্যাপকতর হতে থাকে, তেমনি অত্যাচার নিপীড়ণের মাত্রাও কঠোর হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার এই বৈষম্য শ্রমজীবী-মানসে যে ক্ষোভের সঞ্চার করে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও তার প্রভাব লক্ষিত হয়। বৃহত্তর গ্রামজীবনও সমষ্টি জীবনচেতনায় জাগরিত হয়ে ওঠে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। মতি মাস্টার, শনু পণ্ডিত এই জীবন-চেতনার ধারাকে প্রবাহিত করেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষগুলোর মাঝে। *বাঁধে* মতি মাস্টার সংঘশক্তির যে চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, *নয়াপত্তনে* এসে শনু পণ্ডিত তা পরিণত করলেন সম্মিলিত শক্তির জয়গানে।

অপরাধ গল্পে তথাকথিত পীর সমাজের ভণ্ডামির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে সালেহার জীবন-কাহিনীর মধ্য দিয়ে। পুরুষ-শাসিত রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার যাঁতাকলে মেয়েরা চিরকালই নিগৃহীত, বঞ্চিত হয়। রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ নারীর করুণ চিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক বাংলাদেশের সেই বিশেষ সমাজসত্যটিকেই এখানে তুলে ধরেছেন। চারবছর আগে চৌদ্দ বছরের কিশোরী সালেহার বিয়ে হয় আশি বছরের তথাকথিত এক পীর সাহেবের সঙ্গে। 'বিবাহ' সম্পর্কটির মধ্য দিয়ে দুটি নর-নারীর যে স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়া, এই চারবছরে সালেহা তার কিছুমাত্র পায়নি। যদিও সালেহার বাবা, দাদা, নানী এই বিবাহের মধ্যে আনন্দের যে উৎসকে আবিষ্কার করেছিল, বাস্তবে তা সালেহার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সালেহার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল নিষেধের কঠিন শৃঙ্খলে বন্দী-

> মানুষের জীবনে অনেক আমোদ-আহ্লাদ থাকে, কিন্তু তার কোনটাই ভোগ করতে পারেনি সালেহা। কারাগার। এ চারটে বছর ঠিক যেন কারাগারের ভিতরই দিন কাটিয়েছে সে। এতটুকু স্বাধীনতা নেই, নেই নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা করার এতটুকু অধিকার।[২৮]

পীর সাহেবের কঠোর পারিবারিক প্রতিবেশের মধ্য দিয়ে রক্ষণশীল সমাজে নারীর অবস্থানকে লেখক বাস্তবরূপ দান করেছেন সালেহার জীবনাচরণে-

> পীর সাহেবের বাড়ীর কঠোর শাসন। ঘরের ঝি-বৌদের বাইরের লোক যাতে দেখতে না পায়, তার জন্যে জানালায় মোটা পর্দা টাঙ্গানো। তা একটু ফাঁক করে বাইরে এক পলক তাকাতে যাবে তাও স্বামীর নিষেধ। শোবার ঘরের ছোট্ট কামরাটা আর রান্নাঘরের ধোঁয়ায় ভরা পরিসরটার ভেতরে তার গতিবিধি সীমাবদ্ধ। বাইরের মুক্ত আলো বাতাসে প্রাণ জুড়ানো ছোঁয়া সে আজ চারটে বছর ধরে পায়নি। ... এ চারটে বছর একটু প্রাণ খুলে শ্বাসও নিতে পারেনি সে। গলা ছেড়ে একটা কথা বলতে কিংবা হাসতেও সাহস পায়নি। পীর সাহেবের কঠোর আপত্তি এতে। মেয়েদের জোরে কথা বলতে নেই। শব্দ করে হাসতে নেই। পদে পদে বাধা। পেট ভরে চারটে ভাত খাবে তারও জো নেই। মেপে মেপে ভাত ওঠে সবার পাতে। পীর সাহেব বলেন, অতিরিক্ত খেলে কেয়ামতের দিন তার হিসাব দিতে হবে।[৩০]

ধর্মের নামে এসকল অন্যায়, অবিচার পুরুষশাসিত রক্ষণশীল সমাজের একটি অতি সাধারণ চিত্র। সমাজের একশ্রেণীর মানুষ ধর্মের মুখোশ পড়ে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষগুলোকে তাদের হাতের ক্রিড়াণকে পরিণত করে। লাঞ্ছিত মানবাত্মা কখনো কখনো প্রতিবাদে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। চারবছর বন্দীজীবন কাটিয়ে সালেহাও বিদ্রোহ করেছিল কিন্তু তার পরিণতি হয়েছিল আরো করুণ, ভয়াবহ। মুক্তির আশায় এক রাতে স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল পথে- অনেকটা সম্মোহিতের মতো। দীর্ঘ কয়েক ক্রোশ পথ হাঁটার পর সম্বিত ফিরে পেল চুলের মুঠিতে টান পেয়ে। 'আত্মসম্মান জ্ঞানী সমাজী জীব'[৩১] পিতার প্রহারে প্রায় অচৈতন্য সালেহার মনে পড়ে গেল মায়ের কথা -

> ... পাষাণ বাবা। মাকেও এরকমভাবে মারতো। মার খেয়ে মায়ের হাড়গুলো সব জখম হয়ে গিয়েছিল। মা কাঁদতো না, কোঁকাতো। আর সুদুর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবতো।
>
> ... বাবা না জানলেও জানে বাবার মার খেয়েই মা মারা গেছে। ডাকু ! এরা সবাই ডাকু ! খুনী![৩২]

সমাজ বিদ্রোহী সালেহাকে অভিহিত করলো কলঙ্কিনী দুশ্চরিত্রা হিসেবে। পীরসাহেব কর্তৃক সালেহার শাস্তি নিরূপিত হলো একশ এক কোড়া বেত্রাঘাত। এই শাস্তি সালেহাকে সহ্য করতে হয়নি। তার আগেই রক্তবমি করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে সে। মৃত্যুর পরও সালেহার অপরাধের নিস্কৃতি মেলেনি নিষ্ঠুর সমাজের কাছ থেকে।

কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে সালেহা অত্যন্ত জীবন্ত ও বাস্তবানুগ। লেখক সালেহাকে সমাজের লাঞ্ছিত, নির্যাতিত নারীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। চারবছরের বন্দীজীবনে সালেহা বুঝতে পেরেছে চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবই আজ তার এ অবস্থার জন্য দায়ী-

> সালেহা বুঝতে পারে, এ দুর্বলতাই এতদূর নিয়ে এসেছে তাকে। নইলে প্রথমেই সে প্রতিবাদ করতে পারতো। স্পষ্ট মনে আছে- তাদের গ্রামের চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে হাসিনার কথা, বাবার পছন্দ করা জায়গায় বিয়ে করতে স্পষ্ট আপত্তি জানিয়েছিল সে।
>
> শেষে একগুঁয়ে মেয়েটি বাবার মুখে ছাই দিয়ে এক রাতে পালিয়ে গেলো, কলেজ পাশ করা এক ছেলের সাথে। সালেহার স্পষ্ট মনে আছে গ্রামের ছেলে বুড়োরা কেমন ছি ছি করছিলো। পুকুর ঘাটে, ঘরের দাওয়ায়, ঢেঁকির চারশে জটলা পাকিয়ে গ্রামের মেয়েরা কেমন হাসাহাসি করতো চৌধুরী বাড়ীর কলঙ্কের বিষয় আলোচনা করে। সালেহাও যোগ দিত তাদের সাথে।
>
> কিন্তু আজ সে বুঝতে পেরেছে। হাসিনা ঠিকই করেছিলো। হাসিনার মতো সালেহাও যদি পালিয়ে যেতে পারতো তাহলে জীবনটা দুঃখের হতোনা।[৩৩]

প্রতিবাদী সালেহা শেষপর্যন্ত সফল না হলেও সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তার সাহসী পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

শিল্পবিচারে গল্পটিতে লেখকের পরিমিতিবোধের অভাব লক্ষণীয়। যেমন পীর সাহেব কর্তৃক ঘোষিত একশো এক কোড়া বেত্রাঘাতের মধ্য দিয়েই যদি গল্পটির সমাপ্তি ঘটতো তবে পাঠকের কাছে সালেহার ট্রাজেডি আরো বেশি দুর্বহ, অন্তর্ভেদী ও ব্যঞ্জিত হয়ে উঠতো। কিন্তু লেখক এরপরও গল্পটিকে অকারণ দীর্ঘায়িত করেছেন, যা অনেকাংশে অপরিমিত ও অপরিশীলিত-

> সকালে রাগের উপর মা মরা মেয়েকে তিনি যথেষ্ট মার মেরেছেন। তার ওপর এক-শ-এক কোড়া এক-শ-এক বেত্রাঘাত ! সে কি সালেহার কোমল দেহে সইবে? অথচ পীর সাহেবের আদেশ। আমার পিঠের উপর একশ এক কোড়া মারেন হুজুর। ওই মাইয়াটারে মাফ কইরা দেন। বাবা পীর সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে।
>
> পীর সাহেবকে কোন উত্তর দিতে হলোনা এর। উত্তর নিয়ে এলো সামছুল। সালেহার ছোট ভাই।
>
> সকাল থেকে রক্তবমি করতে করতে ঘন্টাখানেক হয় সালেহা মারা গেছে।[৩৪]

এই অসঙ্গিত সত্ত্বেও সালেহার জীবনের করুণ ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে লেখক বাংলাদেশের সমাজসত্যের একটি বিশেষ দিককেই উন্মোচন করেছেন *অপরাধ* গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান নাৎসীবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের বিভীষিকাময় ভাষারূপ *ম্যাসাকার* গল্পে ডাঃ চৌধুরীর অভিজ্ঞতার আলোকে যুদ্ধের নৃশংসতা এবং বর্বরতার কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য একের পর এক অঞ্চল করায়ত্ত করেছে, হত্যা করেছে অগণিত নিরীহ মানুষকে, নির্মম নির্যাতন

চালিয়েছে নারীর উপরে। শান্তিকামী মানুষের নিরুদ্বিগ্ন জীবনে যুদ্ধ কেবল অভিশাপই বয়ে এনেছে। ষোল বছরের কিশোর জর্জ, প্রেমিক যবুক এডওয়ার্ড অথবা কিশোরী লুইসার মতো অগণিত মানবাত্মা যুদ্ধের ভয়াবহতার কাছে নির্মমভাবে বলিদান করেছে। ষোল বছরের কিশোর জর্জ যেমন ফিরে যেতে পারেনি মায়ের কাছে, তেমনি এডওয়ার্ডও প্রেমিকা ম্যারিয়ানার অন্তর্জ্বালার কারণ না হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। যুদ্ধ তাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিপথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ জর্জ, এডওয়ার্ডের মতো শান্তিকামী মানুষগুলো কেউই যুদ্ধ চায়নি। কিন্তু -

> ... সরকার সৈন্যবৃত্তি গ্রহণ করাটাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকুক কিম্বা না থাকুক সবার গলায় একটা করে ব্রেনগান ঝুলিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়া চাই-ই।[৩৫]

ডাক্তারের সঙ্গে মেজর কলিনসের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতালোভী পেশীশক্তির সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সুস্পষ্টরূপ লাভ করেছে-

> ... Struggle for existence বাঁচবার জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাবো! আর যত পারবো শত্রুদের হত্যা করবো। মানুষের কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। মানুষ চাইনা আমরা। আমরা চাই মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়াম খনিগুলো। সোনা ফলানো শস্যভূমি আর বড় বড় কারখানাগুলো, আর চীন-ভারতের মতো কলোনীগুলো, যেখানে আমরা আমাদের সমস্ত রদ্দি মালগুলো চালাতে পারবো। তার জন্য প্রয়োজন হলে আমরা রোগজীবানু ছড়িয়ে দেবো ওদের ঘরে ঘরে। এটম বোম মেরে নিশ্চিহ্ন করে দেব ওদের। আর মেশিনগান দিয়ে-টুকরো টুকরো করে ফেলবো ওদের শান্তির কপোতকে।[৩৬]

'যুদ্ধ চাইনা'- শুধু এটুকু বলার অপরাধে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঝড়া হয়েছে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের বুক। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ক্ষেতের ফসল আর হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে নারীমাংসের উপর। বন্দীশিবিরে নির্যাতিত নারীর করুণ চিত্র ফুটে ওঠে লেখকের বর্ণনায় -

> উলঙ্গ। একেবারে উলঙ্গ, বিবস্ত্রা নারীদেহ সব ছড়িয়ে আছে মেঝের উপর, এখানে ওখানে, ইতস্তত : বিক্ষিপ্ত মাটির ঢেলার মতো। শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে ওদের শীর্ণ হাতগুলো, দেয়ালের আঙটার সাথে।[৩৭]

এই পাশবিকতার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আবিষ্কার করেছে তাদের বিজয়কে। এ প্রসঙ্গে মেজর কলিনসের উদ্ধৃতিটি স্মরণ করা যেতে পারে -

> ... হাঃ! হাঃ! হাঃ! ইরান, তোরান আর মিসরের নেকাব পড়া মেয়ের মোমের মত দেহগুলো আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি হয়ে রইবে। রাশ্যায় উজবেকি আর কাজাকি তরুণীর শালীনতার বুকে ছুরি হেনে, ওদের ন্যাংটা নাচাবো আমরা, ভারতের লজ্জাবতী মাংস-পিণ্ডগুলোর ঘোমটা

> উলটিয়ে আমরা চুমো খাব। আর আমাদের কামনা চরিতার্থের জন্য ওদের আমরা ব্যবহার করবো। ঠিক জুতো আর মুজোকে আমরা যে রকম ব্যবহার করে থাকি।[৩৮]

লুইসাও বন্দীশিবিরের যুদ্ধ-শিকার নির্যাতিত এক নারী। আরো অনেক শান্তিকামী মানুষের মতো সেও যুদ্ধকে ঘৃণা করেছে। লুইসা বিশ্বাস করতো- শোষণ আর সংকল্পের দৃঢ়তার মধ্য দিয়েই একদিন জেগে উঠবে লাঞ্ছিত মানবাত্মা -

> মাটির মানুষগুলো নিশ্চয়ই একদিন জাগবে। আর শয়তানদের মুখোশ খুলে ফেলবে তারা। তাদের জাগরণের দুর্বার স্রোতে কোথায় ভেসে যাবে যুদ্ধের দালালরা আর অত্যাচারী ধনকুবেররা তখন একটা নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি হবে, যেখানে দুঃখ দুর্দশা, অভাব-অনটন বলে কিছু থাকবেনা, মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ, এত হিংসা বিদ্বেষ সব কিছুর অবসান হবে।
> আর পৃথিবীতে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হবে,[৩৯]

সম্ভাবনাময় আগামীর স্বপ্ন বুকে ধারণ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে লুইসা, আর ডাক্তারের মাঝে প্রোথিত করে গেছে তার স্বপ্নের বীজকে। জর্জ, এডওয়ার্ড, লুইসার মতো অগণিত মানুষের রক্তাক্ত আত্মদান ডাক্তারের মাঝে যে ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গকে প্রজ্জ্বলিত করেছে তাই প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়েছে মেজর কলিনসকে চপেটাঘাতের মধ্য দিয়ে। লেখক যাকে অভিহিত করেছেন 'শান্তি সংগ্রামে'র 'প্রথম পদক্ষেপ' হিসেবে। দ্বিতীয় মহাসমর বিশ্বব্যাপী যে সংকটের সৃষ্টি করেছিল তৎকালীন বাংলাদেশেও তার প্রভাব পড়ে। যুদ্ধের ভয়াবহতা আর নিত্য- প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি শান্ত জনজীবনকে ধ্বংসের প্রান্তে ঠেলে দেয়। চারদিকে শুধু অভাব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর মৃত্যুর হিমশীতল বিভীষিকা। ডা. চৌধুরীর স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ভয়াবহ সমাজচিত্রটি ফুটে উঠেছে-

> পথে পথে মোড়ে মোড়ে আর রাস্তার আনাচে কানাচে বসে বসে ঠুকছে, রক্ত মাংসহীন শবের দল, এক নয় দুই নয় হাজার হাজার। পথের কুকুর আর আকাশের শকুনদের ভোজসভা বসেছে নর্দমার পাশে। আধমরা মানুষগুলোকে টানা হেচরা করে মহা-উল্লাসে ভক্ষণ করছে ওরা। দ্বিতীয় মহাসমর, আর দুর্ভিক্ষ জর্জরিত সোনার বাংলা, চারদিকে শুধু হাহাকার, অন্ন নেই! বস্ত্র নেই! নেই! নেই! কিছু নেই! শুধু আছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর অভাব অনটন।
>
> ... চিতার পর চিতা জ্বলে উঠলো সোনা ফলানো দেশের পল্লীতে পল্লীতে, মাটি খুঁড়ে কবর দেবার অবসর কই? খরস্রোতা নদীগুলোও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, মরা টানতে টানতে। শান্তিপ্রিয় মানুষ সব ভীত, ত্রস্ত এই বুঝি সাইরেন বাজবে, আর সাথে সাথে আরম্ভ হবে নরহত্যা যজ্ঞ। এক মুহূর্তে বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে মানুষের বহু কষ্টে গড়া ওই সুন্দর শহর, বহু মূল্যবান মিউজিয়াম আর বহু সাধনার পর সৃষ্ট ওই বিশাল পাঠাগার। ...

> ... মান সম্মান নিয়ে বাঁচা বুঝি দায় হয়ে পড়লো এবার। শিকারী কুকুরের মতো ওত পেতে আছে গোরা সৈন্যগুলো সব। বদ্ধ দোরের আড়াল থেকে দুরু দুরু বুকে কাঁপছে গ্রাম্য তরুণীরা। মাতৃময়ী বাঙালি নারীর দেহ নিয়ে চারদিকে চলছে ছিনিমিনি খেলা, অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানরা সব ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে। আঁস্তাকুড়ের ছাইয়ের গাদায়, শহরের নর্দমায় আর জলপচা খানা ডোবায়।
>
> এক হাত কাপড়। শুধু এক হাত কাপড় আর এক মুঠো ভাতের জন্য ওরা বিক্রি করে দিচ্ছে ওদের আপন পেটের ছেলেমেয়েকে আর কলমা পড়ে বিয়ে করা বৌকে।
>
> *কি একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। শুধু একটা মহাসমর। আর মানুষগুলোকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলো আদিম যুগের নরখাদকের দেশে।*[৪০]

আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ জহির রায়হান *ম্যাসাকার* গল্পে একটি নির্দিষ্ট সময়কে ধরতে চেয়েছেন। গল্পটির দুর্বলতর বৈশিষ্ট্য এর সংলাপধর্মিতা, দৃশ্যবদ্ধতা এবং মন্থরগতি। তথাপি কাহিনীর বর্ণনা, আবেগ এবং চরিত্রের অভ্যন্তরীণ রোমান্টিকতা গল্পটিকে লক্ষণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে। নির্জন নিস্তব্ধ রাতে যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটি কিশোরীর কন্ঠ, বন্দীশিবিরে নির্যাতিত মৃত বিবসনা লুইসার মৃতদেহ কিংবা লুইসার ছোট বোনের সেবা ও সান্ত্বনা পাঠকহৃদয়ে একটি আবেগী, রোমান্টিক ও রহস্যময় বাতাবরণ সৃষ্টি করে। গল্পটির শৈল্পিক অসঙ্গতির কারণ জহির রায়হানের অনভিজ্ঞতা। কেননা, *ম্যাসাকার* গল্পটি যখন লেখেন তখন তিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। অভিজ্ঞতার এই অপূর্ণতা সত্ত্বেও লেখকের মানসিক অভিযাত্রা এবং আন্তর্জাতিক-চেতনা প্রশংসনীয়।[৪১]

সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জীবনাচরণ ও মানসিক প্রতিবেশের প্রতিফলন *অতি-পরিচিত* গল্প। আসলামের সহপাঠী ট্রলির বাবা আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করেন, সামান্য রেশনের দোকান থেকে আজ তার রমরমা অবস্থা। জীবনের সবকিছুকে তিনি ঐশ্বর্য আর আভিজাত্যের মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করেন। মেহগিনি কাঠের রঙীন সেলফে নানা পুস্তক সাজানো সুদৃশ্য লাইব্রেরি তার অর্থের প্রাচুর্যকেই শুধু বাড়িয়ে তোলে, মনন-ঋদ্ধতাকে নয়। তাই লাইব্রেরিতে গীতাঞ্জলির ইংরেজীর অনুবাদ থাকলেও তিনি জানেননা লেখকের নাম। ট্রলির বাবার বিশাল লাইব্রেরিটি যেমন আসলামকে বিস্মিত করেছিল, তার এই অজ্ঞতাও তেমনি আহত করেছিল। আসলামের বিস্ময় আরো বেড়েছিল মাতৃভাষার দাবি আদায়ে সমকালীন ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে ট্রলির বাবার প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবে-

> এ দেশের ছেলেমেয়েগুলো সব গোল্লায় গেছে। উচ্ছন্নে গেছে সব। নইলে ইসলামী ভাষা ছেড়ে দিয়ে ওই কুফুরী ভাষার জন্য এত মাতামাতি কেন? ... ইসলাম দেশে ইসলামী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হবে এতে কোন সন্দেহ নাই।[৪২]

ট্রলির মনোভাবেও তার বাবার কথার প্রতিধ্বনি মেলে-

> বাংলাভাষার নিজস্ব ঐতিহ্য বলতে কিছুই নেই। একেবারে নাথিং। নট এ সিংগল ফাদিং। বাবার সাথে তাল মিলিয়ে বললো ট্রলি।[৪৩]

ভাষার মতো নিজের দেশের প্রতিও ট্রলির কোন ভালবাসা নেই। অপরাপর দুই বোনের মত সেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে পরবাসী জীবন বেছে নিতে আগ্রহী। ধর্ম, ভাষা ও জাতীয়তার প্রশ্নে পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী ট্রলির বাবার মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণীর মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সামন্ত-মূল্যবোধ-আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। ধর্ম এবং শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাকিস্তানের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে পূর্ববাংলাকে গড়ে তোলে আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্তবাদী সমাজরূপে। এই অবরুদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই বিকশিত হতে থাকে পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আলোচ্যে গল্পে লেখক ট্রলির বাবাকে একজন স্থূল শূন্যগর্ভ মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করে সমকাল সংরক্ত সমাজ-বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।

২.

শিল্প-সাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ে জহির রায়হানকে আমরা পাই একজন চলচ্চিত্রকাররূপে। ছাত্রাবস্থায় তিনি বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্পী কারদারের সাহচর্যে আসেন এবং সহকারী পরিচালকরূপে 'জাগো হুয়া সাবেরা'তে কাজ করেন। পরবর্তীতে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং *কাঁচের দেয়াল*, *জীবন থেকে নেয়া*, *জ্বলতে সুরযকে নিচে*, *স্টপ জেনোসাইড* (অসম্পূর্ণ), *লেট দেয়ার বি লাইট* ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধ করেন। চলচ্চিত্র পরিচালনার পাশাপাশি সাহিত্য রচনা ও তিনি অব্যাহত রেখেছেন। 'সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র যদিও দুটিই শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম কিন্তু সাহিত্যক জীবনের সঙ্গে চলচ্চিত্রকারের জীবনের সম্পর্ক কখনই কবজকুণ্ডলের মতো ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য নয়। দুজনের মৌল মনোগঠনের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সাহিত্যিক আত্মমগ্ন, ঈশ্বরের মতো অনাসক্ত এবং জনবহুল শোভাযাত্রা রিক্ত নিঃসঙ্গ পথপরিক্রমায়ই তিনি অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। অন্যদিকে চলচ্চিত্রকার অতিমাত্রায় প্রকাশমান এবং অন্যের সঙ্গে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও জনতার বিপুল সমারোহে পরিক্রমণই তার মৌলিক চারিত্র্য।'[৪৪] চলচ্চিত্র মাধ্যমে সার্থক হতে পারলেও অন্তর্গূঢ়ভাবে তাঁর এ পর্বের রচিত সাহিত্যে কখনো কখনো দ্বিধান্বিত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। তথাপি সাংগঠনিক দিক দিয়ে এ পর্যায়ের গল্পগুলো যেমন যুক্তিনিষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত, তেমনি রসনিস্পত্তির দিক দিয়েও অধিকতর ব্যঞ্জনাময় ও গীতধর্মী। সীমাবদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতা এবং পরিমিত শিল্পবোধের অভাবে তাঁর প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলিতে যে শৈল্পিক ত্রুটি লক্ষণীয়, এ পর্যায়ে তা অনেকাংশে তিনি কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছেন।[৪৫] *ইচ্ছা-অনিচ্ছা*, *স্বীকৃতি*, *জন্মান্তর*, *পোস্টার*, *দেমাক*- এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্প।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক চিত্রিত হয়েছে- *ইচ্ছা অনিচ্ছায়*। গ্রামের বড়লোক জোতদার মাতব্বরদের দ্বারা শোষিত বঞ্চিত হয় খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। এই মহাজনী জোতদার বড়মিয়াদের কূটবুদ্ধিজাত শোষণ ও সামাজিক অনুশাসন কিভাবে মৃত্তিকাসংলগ্ন দরিদ্র মানুষের জীবনের চাকাকে স্তব্ধ করে দেয় বাস্তভিটা উন্মুলিত বিধবা বিন্তি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রাম্য জোতদার কর্তৃক শোষিত -নিস্পেষিত বিন্তিকে লেখক আলোচ্য গল্পে নিরন্ন শ্রমজীবী সমাজের প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপন করেছেন।

বিন্তির স্বামী আবুল হঠাৎ ম্যালেরিয়া জ্বরে মারা গেলে ছোট ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে অথৈই সাগরে পড়ে। অথচ কি হাসিখুশি টগবগে মানুষ ছিল আবুল -

> হাসিখুশি ভরা মানুষ। শক্ত সামর্থ দেহ। বিন্তিকে কতই না ভালবাসতো সে। হাটে গেলে রোজ ঠোঙ্গায় করে চার পয়সার বাতাসা কিংবা দু পয়সার ডালমুট নিয়ে আসতো বিন্তির জন্য। আদর করে হাতের মুঠোয় পুরে দিয়ে কানে কানে বলতো সোনাদানা কিছু নাই, আর কি দিমু তোরে। আল্লা মিয়ায় গরীব কইরা বানাইয়াছে মোরে।[৪৬]

স্বামীর মৃত্যুর পর শুরু হয় বিন্তির বেঁচে থাকার লড়াই। মিয়াবাড়ীতে ধানভানার কাজ করে তিনটে ছেলে মেয়ে নিয়ে বিন্তি তার জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যায়। নানা প্রতিকূলতা তার চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে, তবু বিন্তি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে রাজী হয়নি পিতৃহীন ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে। বিন্তির চলার পথ আবারো থমকে যায় দুরন্ত কালবৈশাখী ঝড়ে একমাত্র নড়বড়ে চালাঘরটা ভেঙে পড়লে। আশ্রয়হীন বিন্তি ছেলে মেয়ে নিয়ে প্রতিবেশী মনার মা'র কুঁড়েঘরে রাতটা কাটিয়ে পরদিন উপস্থিত হলো বড়মিয়ার কাছে। দু'দুবার হজ্জ্ব করে আসা বড়মিয়াকে সবাই মান্য করেন। বিপদে আপদে গ্রামের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষগুলো সাহায্যের জন্য ছুটে আসে পরহেজগার বড়মিয়ার কাছে। সাহায্য তিনি সবাইকেই করেন, তবে তা নিঃস্বার্থভাবে নয়। তারই পরিচয় পাই নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে-

> মহাজনী কারবার করেন বড় মিয়া। তবে, সুদ খাননা। সুদের নাম কেউ নিলে, গালে চাটি মেরে সাতবার তওবা পড়ান তাকে। লোকে অলঙ্কারপত্র বন্ধক রাখে। বড়মিয়া দু'চার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন তাদের। তবে, সর্ত আছে একটা। মাস তিনেকের মধ্যে টাকা শোধ না দিতে পারলে, অলঙ্কারগুলো বড় মিয়ার হয়ে যায়। মালিকের তাতে কোন অধিকার থাকে না। আর তাই বড়মিয়ার লোহার সিন্দুক দিন দিন ভর্তি হয়ে আসে।[৪৭]

বিন্তি তার হাতের সম্বল বালা জোড়ার বিনিময়ে পাঁচটি টাকা নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে কোন রকমে ভাঙা কুঁড়েটাকে বসবাস উপযোগী করে নেয়। গ্রামের করিম মোল্লা বিন্তিকে পরামর্শ দিল দু'চারজন মোল্লা ডেকে মিলাদ পড়িয়ে নতুন ঘরে ওঠার জন্য। এতে ঘরের ভিত পাকা হবে, কোন রকম বালা-

মছিবত আসবেনা। বিন্তিদের মত মানুষের কাছে করিম মোল্লারা 'আল্লার ওলি মানুষ'। তাই বদদোয়ার ভয়ে বড়মিয়ার পরামর্শে বিন্তি তার শেষ সম্বল বসতভিটাটা সাদা কাগজে টিপসই দিয়ে বন্ধক রেখে বারো টাকায় গ্রামের মোল্লাদের খাইয়ে মিলাদ পড়াল। মোল্লাদের দোয়া আর সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত বিন্তি তার নতুন ঘরে নিদ্রা গেল।-

> ঝাঁপিটা লাগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো বিন্তি। কালবৈশাখীকে আর কোন ভয় নেই তার। ভয় নেই কোন দুরন্ত ঝড়ের কঠোর ভ্রূকুটিকে। ঘরে ফেরেস্তা এনেছে সে। খোদার ফেরেস্তা। যে খোদা এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছে। যার ইঙ্গিতে চলছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
> প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠলো বিন্তির মুখানা।[৪৮]

রাত না ফুরোতেই বিন্তির স্বপ্ন চূর্ণ হল কালবৈশাখী ঝড়ে। আজ বিন্তি নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। বিন্তির মত শ্রমজীবী মানুষেরা এভাবেই নিঃস্ব, শোষিত হচ্ছে বড়মিয়া আর করিম মোল্লাদের মত সমাজপতিদের দ্বারা।

নিরন্ন, শ্রমজীবী মানুষের প্রতীক চরিত্র হিসেবে বিন্তি জহির রায়হানের সার্থক সৃষ্টি। বিন্তির কাছে খোদা ভক্ত পরহেজগার জোতদার বড়মিয়া ছিল সাক্ষাৎ দেবদূত, তার উপদেশ বিন্তির নিকট সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদস্বরূপ। আর করিম মোল্লা, কাসেম মোল্লা, সুলতান মৌলভীরা আল্লার ওলি যাদের দোয়ায় সমস্ত বিপদ কেটে যায়। বিন্তি ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি ছদ্মবেশী এইসব ভালমানুষরাই তার সর্বস্বান্তের মূল কারণ। বিন্তির প্রতি তাদের সহমর্মিতা, সহানুভূতি তাকে রিক্ত, নিঃস্ব করবারই পরিকল্পিত কৌশল। সবকিছু হারিয়ে বিন্তি যখন তার শ্রেণীশত্রুকে চিনতে পেরেছে তখন সে নিরূপায়, এক সর্বগ্রাসী ঘৃণামিশ্রিত 'কাঁপা ঠোঁটের' অদ্ভুত হাসি বিচ্ছুরিত করা ছাড়া প্রতিবাদের আর কোন ভাষাই সে খুঁজে পায়নি।-[৪৯]

> সকালবেলা বড় মিয়ার মেজ ছেলেকে উর্দু পড়াতে যাচ্ছিলেন কাসেম মোল্লা। বিন্তির ভাঙা কুঁড়েটার দিকে চোখ পড়তে অনেক আফসোস করলেন তিনি খোদা তোরে পরীক্ষা কইরতাছে বিন্তি। ...
>
> ছাগলে দাড়িগুলোর ভেতর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন তিনি। হয়তো কোন বড় মুছিবত আছিলো তোর উপর। খোদায় ছোট্ট মুছিবত দিয়া পার কইরলেন সেইডা। ঘাবড়াইস না। এহন কান্নাকাটি কইরা খোদার কাছে মাপ চা। খোদার রাস্তায় কিছু খরচ কর। আহা-খোদায় যা করে ভালার লাইগাই করে।
>
> ... কাসেম মোল্লার দিকে তাকিয়ে কাঁপা ঠোঁটে অদ্ভুতভাবে হাসলো বিন্তি।[৫০]

জীবন সম্পর্কে লেখকের এই অভিজ্ঞতাই তাঁর মৌল ব্যক্তিত্ব- এই উপলব্ধির গুণেই বিন্তি এমন একটি বেদনা-নিবিড় চরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে। এই গল্পের অন্যান্য চরিত্র বিশেষ করে বড়মিয়ার দুই বিশিষ্ট সহযোগী কাসেম মোল্লা ও সুলতান মৌলভীর চরিত্র চিত্রণে লেখক অসাধারণ দক্ষতার পরিচয়

দিয়েছেন।[৫১] শঠ, প্রবঞ্চক, ধর্মব্যবসায়ী এই চরিত্রদুটোকে লেখক স্বল্প পরিসরে চিত্রিত করেছেন-

> মুরগীর হাড্ডি চিবোতে চিবোতে বিন্তির রান্নার অজস্র প্রশংসা করলেন কাসেম মোল্লা। বললেন, আহা বড় স্বাদের রাঁধা রাঁধছ আবুর বৌ। বড় স্বাদের রাঁধা রাঁধছ।
>
> সুলতান মৌলভী বললেন। আরো দু'এক টুকরা গোস্ত দাও না আবুর বৌ। কেপ্পনি কর ক্যান। খোদার কামে কেপ্পনি ভালা না। ঠিক-ঠিক। কাসেম মোল্লা সমর্থন জানালেন তাকে। খোদার কামে কেপ্পনি ভালা না বৌ।[৫২]

অভিজ্ঞতা কত প্রত্যক্ষ হলে এমন জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে উল্লেখিত চরিত্র দুটি তার প্রমাণ।

জহির রায়হানের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলোর মধ্যে *স্বীকৃতি* অন্যতম। জগতের সকল কর্মযজ্ঞে পুরুষের পাশাপাশি নারীও যে সক্রিয় অবদান রাখতে পারে মনোয়ারা ও তার মেয়ে সেলিনার মধ্য দিয়ে লেখক সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বস্তুত *হারানো বলয়ে*'র আরজুর বন্দীদশার মাধ্যমে যে জীবনপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল *স্বীকৃতি*'র মনোয়ারা ও সেলিনার মধ্যে দিয়ে অবরুদ্ধ সেই জীবনচেতনাকে লেখক আরো বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরেছেন। মুনিরের উত্তর পুরুষরূপে এখানে আমরা জামানকে প্রত্যক্ষ করি। *স্বীকৃতি*'র জামান অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়। যে জীবনাদর্শের দ্বারা মুনির চালিত হয়েছিল জামানের মাঝে তা আরো বেশি গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ। জামান বিশ্বাস করতো সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় শুধু পুরুষরাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেনা, নারীরাও সমানভাবে অংশ নেবে। স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব কেবল পুরুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা, নারীরও তাতে থাকবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। বস্তুত জামান কর্তৃক মনোয়ারার প্রশিক্ষণ বিপ্লবী কর্মীদের দ্বারা দেশের নারীসমাজকে শিক্ষিত করে তোলারই প্রচেষ্টা। প্রচলিত মূল্যবোধ, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও রক্ষণশীল সামাজিক প্রতিবেশের কারণে শেষপর্যন্ত জামানের মহতী উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং আন্দামানের বন্দী প্রতিবেশে নির্বাসিত হয়েছে জামান। কিন্তু যে আদর্শের আলোকবর্তিকা জামান মনোয়ারার মাঝে প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছিল অতঃপর সামাজিক পটপরিবর্তনে মনোয়ারার মেয়ে সেলিনার মাঝে সেই জীবনাদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে।[৫৩]

রক্ষণশীল সমাজ মনোয়ারার চলার পথে পদে পদে বাধার দেয়াল উঁচিয়ে তুলেছে। কেননা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে তাকে শুধু সংসারধর্মের মাঝেই আবদ্ধ করে রেখেছে। কন্যা-জায়া-জননী এর বাইরে শৃঙ্খলিত নারীর আর কোন পরিচয় সমাজ স্বীকৃতি দেয়নি। নারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধের এই প্রচেষ্টা সেই প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে-

> প্রাচনীকালে, প্রাচীনকালে কেন? মধ্যযুগেও পুরুষেরা নারীর উপর অমানুষিক উৎপিড়ন চালাতো। যখন, তখন যথেচ্ছভাবে তাদের মারপিট করতো। শুধু তাই নয়। কোমরে, গলায়, হাত পায়ে শিকল বেঁধে ঘরের ভেতর ফেলে রাখতো ওদের। পাছে ওরা পালিয়ে যায়। নারী সে ট্রাডিশন ক্ষুণ্ণ করলো না। আজও তাই তারা হাতে, পায়ে, গলায় শেকল-অবশ্য আগে লোহার ছিল, এখন সোনার পরে গর্ব অনুভব করে।[৫৪]

সময়ের পরিবর্তনে বন্দিনী নারী আজ মুক্তির আলোয় মেতেছে। শিক্ষার প্রসার এবং প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলন বৃত্তাবদ্ধ নারীর জীবনে এনেছে পরিবর্তনের সুর। নারী আজ তার স্বাতন্ত্র্য এবং অধিকার আদায়ে হয়েছে সোচ্চার, প্রতিবাদী। রক্ষণশীল সমাজ আরোপিত প্রতিকূলতাকে অতিক্রমের সাহস মনোয়ারার হয়নি, প্রতিভা থাকা স্বত্ত্বেও নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ সে পায়নি বিরুদ্ধ প্রতিবেশের কারণে। আর দশটি সাধারণ বাঙালি নারীর মতো প্রচলিত সমাব্যবস্থার প্রতি সেও আত্মসমর্পিত হয়েছে। কিন্তু তার কন্যা সেলিনা কোন বাধাকে মানেনি। স্পষ্টভাষায়, দৃঢ় কণ্ঠে সেলিনা তার ম তাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে-

> কেন, মেয়েদের বুঝি সভা-সমিতিতে যেতে নেই?
> আমি যাবো।[৫৫]

সেলিনার এই বিদ্রোহ মনোয়ারাকে জামানের কথা মনে করিয়ে দেয়। কন্যার প্রত্যয়ী মুখে মনোয়ারা দেখে তারই প্রতিচ্ছবি। তাই এই পরিবর্তনকে অস্বীকার করার সাহস মনোয়ারার হয়নি-

> না, না, এ কি করছে সে। কেন, কেন, কি অধিকার তার রয়েছে এ পরিবর্তনকে অস্বীকার করার? দূরে বহু দূরে কোনও নির্জন দ্বীপের নিরালা তটে যেন একটা স্বপ্নমাখা আবছা শৃঙ্খলিত মূর্তি তার চোখে ভেসে ওঠে।
>
> না, না, সে স্বীকার করবে একে- এই পরিবর্তনকে, এই বিপ্লবী ঝড়ো হাওয়াকে।[৫৬]

স্বীকৃতি গল্পে লেখক নারীর মুক্তিকামী বিপ্লবী সত্তাকে তুলে ধরেছেন সেলিনা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। শৃঙ্খলিত নারী সমাজ জেগেছে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। সেলিনা এই চেতনারই শৈল্পিক স্বাক্ষর।

পনের বছরের মন্তর পুনর্জন্মের কাহিনী *জন্মান্তর*। সুখী, সুন্দর গ্রামজীবন থেকে উন্মুলিত মন্তু নির্বাসিত হয়েছে যান্ত্রিক নাগরিক জীবনে। আর জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য বেছে নিয়েছে অন্ধকার পথ, কিন্তু ছাপোষা কেরানীর পারিবারিক দুরবস্থা মন্তর মাঝে জাগিয়ে তুলেছে ভিন্ন এক অনুভূতি। পকেটমার মন্তর মধ্য দিয়ে জন্ম নিল মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আরেক মন্তু। অন্ধকার থেকে আলোর পথে ধাবমান মন্তর এই জীবনকথাকে লেখক শিল্পিত

ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন *জন্মান্তর* গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩/১৩৫০) ভয়াবহ সমাজপটে মন্তু চরিত্রটি বিকশিত হয়েছে।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর মহামারী মন্তুর জীবনে শুধু অভিশাপই বয়ে এনেছে। বাবা, মা, ভাই, বোন সব হারিয়ে এক মুঠো ভাতের জন্য শহরের পথে পা বাড়িয়েছে মন্তু। এখানে দেখা হয় পকেটমার জুলমত সিকদারের সাথে। তারপর একসময় সে হারিয়ে যায় অন্ধকার গলির চোরা রাস্তায়। পকেট মারার অপরাধে এই পনের বছরের জীবনে পাঁচবার জেল খেটেছে মন্তু। নিজেকে আরো শানিত করেছে, জেল তাই মন্তুর কাছে গুরু সমতুল্য। চাকচিক্যময় নাগরিক জীবনের সাথে মানিয়ে নেয়া মন্তু পনের বছরেই বুঝে গেছে - অর্থই জীবনের সকল কিছুর উৎস। কখনো ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়লে জীবনটাকে নিজের কাছে বড় অদ্ভুত মনে হয় মন্তুর-

> সুখীয়াল স্বপ্নে ভরা দিন।
>
> তখন নেহায়েৎ বাচ্চা ছিল মন্তু। সূর্য উঠতেই ক্ষেতের আইলে বাবার জন্য হুকো আর পান্তা নিয়ে হাজির হতো সে। বাবা জমিতে হালচাষ করতেন; মই দিতেন; আর ধান বুনতেন।
>
> বছর শেষে যা ফসল ঘরে আসতো, তা দিয়ে কোন রকমে দিন চলে যেত ওদের। বাবা বলতেন, মন্তুরে আমার লেখাপড়া শিখামু। ইসকুলে পাঠামু ওরে।[৫৭]

যুদ্ধ বাবার সে স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিয়েছে। যুদ্ধের বিভীষিকা শান্ত গ্রামজীবনে নিয়ে এলো ভাঙ্গনের সুর। বাড়তে লাগলো ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা। বস্ত্র, কেরোসিন, ভোজ্যতেল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং দুস্প্রাপ্যতা জনগণের সামগ্রিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশব্যাপী, দলে দলে লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে ভিড় জমাতে লাগল। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিকড় উন্মুলিত মানুষের ভিড়ে ছেয়ে যায় শহরের অলি-গলি। গল্পের প্রথমাংশে মন্তুর জীবনকাহিনী বর্ণনায় এই বিপর্যস্ত সমাজ-প্রতিবেশ লেখকের লেখনীতে হয়ে উঠেছে দেশকালের পরিমিতিময় শিল্পিত ক্যানভাসে -

> তখন যুদ্ধের মওসুম। সৈন্যরা এসে জমিগুলো সব দখল করে নিলো ওদের। সেখানে ঘাঁটি করবে ওরা। প্লেন ওঠানামা ঘাঁটি। সৈন্যরা এলো।
>
> সাথে নিয়ে এলো অসংখ্য ট্রাক, লরী আর বুলডোজার।
>
> আর যে দুটো জিনিস সাথে করে এনেছিল ওরা, তা হলো দুর্ভিক্ষ আর মহামারী, দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে ... গাঁও ছেড়ে দলে দলে লোক ছুটেছে শহরের পথে। সারি সারি লোক চলছেতো চলছেই ...

> শহর নয়তো প্রেতপুরী। পথে, ঘাটে, ডাষ্টবিনে মৃতের ছড়াছড়ি। অলিতে গলিতে অসংখ্য ক্ষুধিতের মিছিল।[৫৮]

অগণিত মানুষের মিছিলে মন্তুও সামিল হয়েছিল। জীবন ও জীবিকার তাগিদে মন্তু হয়ে যায় পকেটমার। তারপর জীবনের আরেক রূপ মন্তু প্রত্যক্ষ করলো দারিদ্র্যপীড়িত কেরানীর সংসারে। মনে পড়ে গেল নিজের অভাব অনটনে ভরা অতীত দিনগুলোর কথা। মন্তুর ভেতরের ঘুমন্ত মানুষটা যেন এতদিনে জেগে উঠল-

> পকেটে হাত দিয়েও টাকাগুলো নিতে পারলো না মন্তু। মোট দেড়শ'টি টাকা। এ দিয়েই এদের কোনমতে মাস কাটাতে হয়। এবার মাত্র পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে কেমন করে চলবে এরা? মরে যাবে নির্ঘাত মরে যাবে। মরে যাবে ওই কচি মেয়েটা! ওর হাড় বের করা বউটা! আর ওই বাকি যে ক'জনা আছে সবাই। সবাই ওরা মরে যাবে। উঃ! ভাবতে গিরে মন্তুর কাঠিন্যে ভরা প্রানটাও যেন কেমন করে উঠলো আজ। নিজের অভাব ভরা অতীত মনে পড়ল।[৫৯]

মানবিক মূল্যবোধের এই জাগরণই মন্তুর পুনর্জন্মের কাহিনী। মন্তু লেখকের পরিণত শিল্প সৃষ্টির স্বাক্ষর। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা দুঃসহ দৈনন্দিনতার মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছে মন্তু। বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রামশীল মন্তুর জীবনে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত এক অম্লান সৌন্দর্যের অভীপ্সা বয়ে নিয়ে এসেছে 'নবী সিকদারের লাল টুকটুকে নাতনী পরীবানু'[৬০] - যার কথা ভেবে এক অজানা শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে মন্তু। মন্তু চরিত্রের এই সৌন্দর্যপ্রীতি তাকে একটি ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।[৬১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালীন বাংলাদেশের সমাজজীবনে ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়। প্রথাগত সমাজকাঠামোর বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উন্মূলিত হয় প্রচলিত মূল্যবোধ এবং সনাতন ধ্যানধারনা থেকে। মানবিক মূল্যবোধের এই বিপর্যয় গণমানসে জন্ম দেয় নঞর্থক জীবন চেতনা, যা সামাজিক অবক্ষয়কে করে ত্বরান্বিত। তথাপি বিপর্যস্ত এই যুগ-পরিবেশেই মানুষ ইতিবাচক জীবনচেতনায় উত্তরণের প্রয়াস চালিয়েছে। *জন্মান্তর* গল্পে মন্তু চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক যুদ্ধোত্তর বিপন্ন সমাজবাস্তবতাকেই তুলে ধরেছেন।

পাক-শাসনামলের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপটে সমাজ-বাস্তবতার একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে *পোস্টার* গল্পে। জীবনের নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ব্যক্তিজীবনের নিরাপদ অবস্থানে থেকে কখনোই বিচার করা যায়না। অনেক কিছুই তখন অপ্রয়োজনীয় এবং বাহুল্য বলে মনে হয়। আর যে মুহূর্তে ব্যক্তি অস্তিত্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, তখনই নিজেদের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়ে উঠি, অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে প্রতিবাদী হয়ে উঠি। বাড়ীর পরিষ্কার দেয়ালে ছাত্রদের লাগানো পোস্টার এক সময় আমজাদ সাহেবের গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল, এই কর্মের বিরুদ্ধে একরকম যুদ্ধই ঘোষণা করেছিলেন তিনি। কিন্তু

যে মুহূর্তে তিনি চাকুরিচ্যুত হন জীবনের সেই সংকটময় মুহূর্তে পোস্টারের ভাষাই হয়ে উঠলো যেন তার অস্তিত্বের কণ্ঠস্বর।[৬২] এল.ডি. ক্লার্ক আমজাদ সাহেবের ব্যক্তিজীবনের এই সংকটের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজজীবনের এই বিশেষ সত্যটিকেই লেখক ভাষারূপ দিয়েছেন *পোস্টার* গল্পে।

সমকালীন ছাত্র-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জনজীবনালেখ্য *পোস্টার*। পাক-শাসনামলের অর্থনৈতিক বিপর্যয় পূর্ববাংলার জনজীবনে গভীর সংকটের সৃষ্টি করে। বস্তুত যে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সমর্থন যুগিয়েছিল কার্যত তার ফল হয়েছিল নেতিবাচক। কৃষিনির্ভর পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের বিকাশে পশ্চিম পাকিস্তান নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করে তুললেও এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয় পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনাকাল থেকে নববিকশিত বাঙালি মধ্যবিত্ত-মানস কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ষড়যন্ত্রমূলক চারিত্র্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনমানস আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে। আর এই আন্দোলনে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ। অধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে ছাত্রসমাজই পাকিস্তানবিরোধী নানা আন্দোলনকে গতিশীল রাখে। যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। পাশাপাশি ব্যাপক খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার, শিক্ষা ও চাকুরীক্ষেত্রে বৈষম্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ সর্বোপরি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অধিকার হরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী ছাত্র-আন্দোলন ক্রমশ বেগবান হয়। অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে ছাত্রদের এই আন্দোলন সাধারণ জনজীবনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ছাত্রসমাজ পরিণত হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে। দেয়ালে পোস্টার লাগানো নিয়ে আমজাদ সাহেবের প্রতিবেশী আফজাল সাহেবের উপস্থিতিতে অনুরণিত হয় তারই প্রতিধ্বনি -

> এ আর কি। ও তো সব জায়গায় লাগিয়েছে ওরা। শহরটাকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে সাহেব। তারিফ করতে হয় এই ছেলেগুলোর। ...
>
> ... দেশের মধ্যে সাচ্চা কেউ যদি থেকে থাকতো ওরাই আছে। ওরাই লড়ছে দেশের স্বার্থের জন্য।[৬৩]

ছা-পোষা নিম্ন-মধ্যবিত্ত কেরানীজীবনের টানাপোড়েনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে আমজাদ সাহেবের পারিবারিক প্রতিবেশের মধ্য দিয়ে। আমজাদ সাহেবের চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক যথেষ্ঠ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে তার দাম্পত্য-কলহ অথচ বাইরে নিজের স্ত্রী সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ, মেজাজের রুক্ষতা, সন্তানদের প্রতি রূঢ় আচরণ, বংশীয় আভিজাত্যবোধ-

জীবনসংগ্রামে ব্যর্থ একজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্ব সংকটকেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এল.ডি. ক্লার্ক হাশমত মিয়া, রমেশবাবু, ডেসপাচার মুলকুত মিয়া, ড্রাফটম্যান আকবর আলী, বৃদ্ধ কেশিয়ার হুরমত আলি, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টাইপিস্ট- এরাও সকলে আমজাদ সাহেবের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি চরিত্র।

দেমাক গল্পে শ্রেণীসচেতন জহির রায়হান দুটি পরিবারের জীবনকথার মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের বিজয়ের ছবি এঁকেছেন। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে আধুনিক সভ্যতা। মানুষ ভোগ করছে নানা সুযোগ সুবিধা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সভ্যতার চাকাকে সচল রাখে শ্রমজীবী মানুষ। পরিশ্রমে তাদের ভয় নয় বরং অহংকার। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিম শেখ একজন সামান্য বাস ড্রাইভার। কালো কুচকুচে লম্বা সুঠাম দেহের অধিকারী রহিম শেখ কাক-ডাকা ভোরে উঠে কাজে বেরোয় আর ফেরে রাত দশটায়। এই কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও সে ক্লান্ত নয় বরং এক ধরনের আত্মতৃপ্তি বোধ করে-

> বাস ড্রাইভার রহিম শেখ। রহিম শেখ বাস চালায়। টাউন সার্ভিসের বাস। ওর কোন ধরাবাঁধা নেই। দৈনিক যা টিকেট বিক্রি হয় তা থেকে পেট্রোল খরচ আর মালিকের কমিশন বাদ দিয়ে বাকি টাকাটা কণ্ডাক্টর, সে আর যে ছোকরাটাকে নবাবপুর-স্টেশন হাইকোর্ট বলে চিৎকার করার জন্য রাখে, সে ভাগ করে নেয়। টাকা যে খুব পায় তা নয়। তবু সেই অল্প কটা টাকা কাপড়ের ব্যাগে পুরে যখন সে বাসায় ফেরে, তখন এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে মন প্রাণ ভরে থাকে রহিম শেখের। কাজ তার গর্ব। কাজ করেই খায় সে। পরের কাছে হাত পাতে না। অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেনা। কিংবা তাদের ওই বাসের মালিকটার মতো পুঁজি খাটিয়ে বসে বসে মুনাফা লুটেনা। কাজ করেই খায় সে। কাজ তার গর্ব।[৬৪]

স্ত্রী আর পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে রহিম শেখের সুখের সংসার। তার স্ত্রী আমেনাও একজন শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি চরিত্র, যে কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে বাড়িতে বসে বেতের ডালা, ঝুঁড়ি, মাদুর তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে। সংসারের স্বচ্ছলতার জন্য স্বামীর সাথে আমেনাও শ্রম দিয়ে যাচ্ছে।

শ্রমজীবী রহিম-আমেনার বিপরীত চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে রহমত-মেহেরুনের মধ্য দিয়ে। রহমত একজন শঠ, প্রবঞ্চক; মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে হাত দেখে পয়সা উপার্জন করে। রহমতের স্ত্রী মেহেরুনও একজন সুযোগসন্ধানী, নীচ, স্বার্থপর মানুষ। যে অন্যায়ভাবে অপরের জিনিস ভোগ করার মধ্যে কোন আত্মগ্লানিবোধ করেনা। স্বামী স্ত্রী দুজনেই প্রতিবেশী অহংকারী রহিম শেখ ও তার পরিবারের প্রতি একধরনের বৈরী মনোভাব পোষণ করে। স্বার্থপর ও শ্রমবিমুখ রহমত সম্পর্কে রহিম শেখের মনোভাবও সুস্পষ্ট-

> হারাম খেতে খেতে এদের হারাম খাওয়ার একটা অভ্যেস হয়ে গেছে। শক্ত সমর্থ, জোয়ান মানুষ, কাজকর্ম একটা কিছু করে খাবে না তো চুরিচামারি করে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে খায়।[৬৫]

কর্মের মাপকাঠিতেই মানুষের জীবনকে বিচার করে রহিম শেখ। দুর্ঘটনায় দুটি চোখ হারালেও রহিম শেখ বা তার স্ত্রী-পরিবার কেউ ভেঙ্গে পড়েনি। ছোট ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে একদা বাস ড্রাইভার রহিম শেখ শহরের রাস্তায় পত্রিকা বিক্রি করে কর্মের পতাকাকে উড্ডীন রেখেছে। শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি চরিত্র হিসেবে রহিম শেখের চরিত্র-চিত্রণে জহির রায়হান শিল্পসার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

একুশের আত্মদান শ্রেণী-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের বাঙালির জাতীয় জীবনে যে সার্বজনীন জীবনচেতনার জন্ম দিয়েছে *মহামৃত্যু* তারই আলেখ্য। গল্পটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে একজন শহীদ ভাষাসৈনিককে কেন্দ্র করে। আসছে বৈশাখে যার বিয়ে হবার কথা ছিল, এই ফাল্গুনেই তার প্রাণপ্রদীপ নিবে গেল। বেঁচে থাকতে যে ছেলেটি কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে-ই হয়ে উঠলো পরম আপন, অনিঃশেষ এক জীবনচেতনার প্রেরণাউৎস-

> কালো, মুখচোরা ছেলেটা বছর খানেকের ওপর থেকেই ছিলো এ বাড়িতে। থাকতো। খেতো, কলেজে যেতো।
>
> কই, কোনদিনও তো চোখে পড়েনি কারো। পড়বেই বা কেমন করে। বাহাত্তর গেরস্তের বাড়িতে কত লোক আসে, কত লোক যায়। কে কার খোঁজ রাখে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে সব সময়। কিন্তু, অকস্মাৎ আজ সবাই এক অদ্ভুত একাত্মতা অনুভব করলো ওই ছেলেটার সাথে। বেদনার্ত চোখ তুলে সবাই তাকালো ওর দিকে।
>
> সারারাত তাকালো ওরা।[৬৬]

'প্রাত্যহিক জীবনে বৈষয়িক কারণে আমাদের মধ্যে বিভেদ থাকে, মতদ্বৈধতা, সংঘাত, দ্বন্দ্ব, মনোমালিন্য, ক্লিন্নতা অনেক কিছুই থাকা সম্ভব কিন্তু হঠাৎ করে ব্যক্তিক ও জাতীয় জীবনে এমন কিছু ঘটে যায়, এমন একটি মহা মিলনের ডাক আসে, যার ঐকান্তিক আহবানে আমরা উদ্বেলিত বিশ্বাসে হয়ে উঠি অভিন্ন, একাত্ম।'[৬৭] বাঙালির জাতীয় জীবনে এই সার্বজনীন জীবনচেতনারই রূপালেখ্য *মহামৃত্যু*। স্বৈরাচারী পাকিস্তানী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারবঞ্চিত-বিপর্যস্ত জনজীবন এক সর্বগ্রাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ছাত্রমিছিলে গুলি চালনাকে কেন্দ্র করে। ভাষার জন্য ছাত্রদেরএই আত্মদান শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-কেরানী-শ্রমিক-কৃষক-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের বাঙালির জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। একুশে ফেব্রুয়ারী তাই সকলের, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালির চেতনায় সঞ্চারিত স্বতঃস্ফূর্ত এক জীবন প্রেরণা, শ্রেণী-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের শক্তি ও সাফল্যেরই সম্মিলিত পরিচয় গাঁথা- এই আন্তর সত্যটি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই লেখক *মহামৃত্যু* গল্পটি রচনা করেছেন। অন্তর্গত এই চেতনা থেকেই পুলিশের

গুলিতে নিহত শহীদের কপালে নিজের কনে আঙ্গুল কেটে রক্ততিলক পড়িয়ে দিয়েছে শিবানী আর তারই দুই সহচরী তাদের কেশগুচ্ছ দিয়ে পরম স্নেহভরে মুছে দিয়েছে শহীদের পায়ের ধুলো। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাদুটি অতিনাটকীয় এবং বাস্তবতা-বিবর্জিত মনে হলেও লেখকের বর্ণনা এবং চিত্রণ কুশলতার গুনে এই আবেগ নিবিড় মুহূর্তদুটোই উত্তীর্ণ হয়েছে পরমার্থিক বাস্তবতায়।[৬৮]

একুশের গল্প চার বছর আগের হারানো তপুকে ফিরে পাবার কাহিনী। *মহামৃত্যু*'র মত এই গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয় বায়ান্নর ভাষা- আন্দোলন। অবশ্য *একুশের গল্প* নামকরণের মধ্যে দিয়েই লেখক সঞ্চারিত করেছেন একুশের চেতনাকে। শহীদের শবদেহের মিছিলের মধ্য দিয়ে যেখানে *মহামৃত্যু*'র শেষ, *একুশের গল্প*'র সেখানেই সূচনা। একুশে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে পরদিন বাইশে ফেব্রুয়ারী কাক-ডাকা ভোর থেকেই দলে দলে অগণিত মানুষ এসে জমা হতে থাকে মেডিকেল কলেজের পুরোনো হোস্টেলের সাম্নে -

> হোস্টেলের বাইরে, সবুজ ছড়ানো মাঠটাতে অগুনতি লোকের ভীড় জমেছিল সেদিন। ভোর হতে ক্রুদ্ধ ছেলে বুড়োরা এসে জমায়েত হয়েছিল সেখানে। কারো হাতে প্লাকার্ড, কারো হাতে শ্লোগান দেবার চুঙ্গো, আবার কারো হাতে লম্বা লাঠিটায় ঝোলান কয়েকটা রক্তাক্ত জামা। তর্জনী দিয়ে ওরা জামাগুলো দেখাচ্ছিল, আর শুকনো ঠোঁট নেড়ে নেড়ে এলোমেলো কি যেন বলছিলো নিজেদের মধ্যে।[৬৯]

শহীদের হত্যার বিচার আর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল এগোতে থাকে সামনের দিকে। স্বৈরাচারী শাসকের পোষা পুলিশবাহিনী ঐদিনও গুলি চালায় জনতার মিছিলে। সেদিনও তপুর মতো অনেকের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে শহরের রাজপথ।

লেখকের ঘণীভূত আবেগ আর সংহত বক্তব্যের প্রসারে 'আমি' নামক উত্তম পুরুষে আবর্তিত *একুশের গল্পে*'র কাহিনী একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র তপু চারবছর আগে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় হাইকোর্টের মোড়ে। কর্তব্যরত পুলিশ গুলিবিদ্ধ তপুর লাশটি তুলে নিয়ে যায়। চারবছর পর একটি কঙ্কালের ছিদ্র করোটি দেখে সেটিকে তপুর 'স্কাল' বলে শনাক্ত করে বন্ধু রাহাত। চার বছর আগে পুলিশের হাত থেকে বন্ধুর যে মৃতদেহ ছিনিয়ে আনতে পারেনি রাহাত, আজ চারবছর পর অকস্মাৎ 'স্কেলিটনে'র মধ্যে তপুকে নতুন করে ফিরে পাবার উপলব্ধি করার আনন্দ ও যন্ত্রণার যুগপৎ অভিব্যক্তিতে গল্পটি স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।[৭০]

বক্তব্যের দিক দিয়ে *মহামৃত্যু* ও *একুশের গল্প*- দুটো রচনাই অভিন্ন । লেখক হৃদয়ে একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্তর-প্রেরণা দুটি গল্পের সৃষ্টিমূলে ক্রিয়াশীল থেকেছে। বস্তুত জহির রায়হানের সাহিত্যসাধনার প্রেরণাশক্তি ছিল বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলন এবং এই চেতনাকে তিনি আমৃত্যু ধারণ করেছেন। ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে একাধিক গল্প উপন্যাস রচনার

মধ্য দিয়ে তাঁর সে জীবনচেতনার স্বাক্ষর মেলে। আর একথা স্বীকার করতেই হবে যে 'একুশে ফেব্রুয়ারীর মতো একটি ঐতিহাসিক ও বহুমাত্রিক ঘটনা একমাত্র জহির রায়হানের গল্পেই বারংবার অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।'[৭১] দৃশ্যযোজনা ও পরিচর্যা এবং চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে *মহামৃত্যু* ও *একুশের গল্প* স্বাভাবিক শিল্পকুশলতায় অভিব্যক্ত হয়নি একথা সত্য; তবে কাহিনী বর্ণনায় লেখক যথেষ্ঠ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন শহীদের মৃতদেহকে ঘিরে বৃত্তাবদ্ধ কৌতূহলী জনতার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা -

> তারপর এক সীমাহীন নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সবাই। ফেকাশে বিবর্ণ চোখগুলো তুলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো ওরা। তারপর আবার তাকালো মাটিতে। শোয়ান রক্তলাল মৃতদেহটার দিকে।[৭২]

আর শমসের আলীর প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লেখক ব্যক্তিমানসে একুশের চেতনাকে আবেগস্পর্শী রূপ দিয়েছেন-

> ... অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো এল.ডি. ক্লার্ক শমসের আলী। দুচোখে অশ্রুর বান ডাকলো ওর। ছি: শমসের ভাই কাঁদছো। এ সময় কাঁদতে নেই। মৃদু তিরস্কার করলো ওকে ফজল শেখ।
>
> ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা স্বরে শমসের আলী বললো। বড় হিংসে হচ্ছে - বড় হিংসে হচ্ছে, ফজলুরে আমি কেন ওর মত মরতে পারলাম না।[৭৩]

অথবা উল্লেখ করা যেতে পারে *একুশের গল্পে* তপুকে আবিষ্কারের বর্ণনাচিত্রটি-

> সেদিন সকালে বিছানায় বসে 'এনাটমি'র পাতা উল্টাচ্ছিলো সে। তার চৌকির নিচে একটা ঝুড়িতে রাখা 'স্কেলিটনে'র 'স্কাল'টা বের করে দেখছিলো আর বইয়ের সাথে মিলিয়ে পড়ছিলো সে। তারপর একসময় হঠাৎ রাহাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, রাহাত সাহেব, একটু দেখুনতো, আমার স্কালের কপালের মাঝখানটায় একটা গর্ত কেন?[৭৪]

৩.

জহির রায়হানের শেষদিকের রচনাগুলো অনেকটা চিত্রনাট্যের মতো, যেন ছোট ছোট বাক্যের চিত্রকল্প। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন- প্রতিবেশে এর কারণ অনুসন্ধানীয়। বস্তুত এই সময়ে জহির রায়হানের প্রধান পরিচয় একজন জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্রকার হিসেবে। কিন্তু পেশাগত অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে আপন শিল্পীসত্তার বাইরে গিয়ে বেশ কিছু বাণিজ্যিক ছবি তিনি নির্মাণ করেন। ব্যক্তিচরিত্রের এই বৈপরীত্য তাঁর শিল্পীমানসে যে বিপর্যয় ও মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল তা লাঘবের জন্য আবার তিনি সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন। চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের বিপর্যস্ত শিল্পীসত্তা কথাশিল্পী জহির রায়হানের উপরে যে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ মেলে এ পর্যায়ের রচিত - *কতগুলো কুকুরের আর্তনাদ*, *ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি*, *কয়েকটি সংলাপ*, *একুশে*

ফেব্রুয়ারী প্রভৃতি গল্পে। সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ছোটগল্পের সংহত ও ব্যঞ্জনাত্মক শিল্পরূপ গল্পগলোতে প্রতিফলিত না হলেও জহির রায়হানের নিরীক্ষাধর্মী, প্রথাবিরুদ্ধ সাহসী শিল্পীসত্তার পরিচয়বাহী উল্লেখিত গল্প-চতুষ্টয়।

'*ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি* এবং *কতগুলো কুকুরের আর্তনাদ* চরিত্র এবং পরিপ্রেক্ষিত বিবর্জিত লেখকের বিচূর্ণিত চেতনা-স্রোতের রূপায়ন।'[৭৫] ভদ্রলোকের শহরে সর্বত্র কুকুরের আর্তচিৎকারের মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থ প্রকাশিত হয়েছে *কয়েকটি কুকুরের আর্তনাদ*- এ। ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি' ও একটি প্রতীকধর্মী গল্প যেখানে বিরুদ্ধ প্রতিবেশে বন্দী একজন মানুষের ইচ্ছা আর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সমকালীন সংকটাপন্ন ব্যক্তিঅস্তিত্ব বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে। বিপর্যস্ত যুগ-পরিবেশের বন্দীদশা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে গল্পের তরুণটির মধ্যে দিয়ে-

> ... যার জীবন সহস্র দেয়ালের চাপে রুদ্ধশ্বাস।
> আইনের দেয়াল।
> সমাজের দেয়াল।
> ধর্মের দেয়াল।
> রাজনীতির দেয়াল।
> দারিদ্র্যের দেয়াল।
> সারাদিন সে ওই দেয়ালগুলোতে মাথা ঠুকছে আর বলছে। আমাকে মুক্তি দাও আমাকে মুক্তি দাও। আমার ইচ্ছেগুলোকে পায়রার পাখনায় উড়ে যেতে দাও আকাশে। কিম্বা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দাও। সেখানে তারা প্রাণভরে সাঁতার কাটুক।
> সারাদিন সে শুধু ছুটছে, ভাবছে আবার ছুটছে।
> এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে।
> ঈর্ষার দেয়াল।
> ঘৃণার দেয়াল।
> মিথ্যার দেয়াল।
> সংকীর্ণতার দেয়াল।
> কত দেয়াল ভাঙবে সে?
> তবু সে আশাহত হয়না। ইচ্ছার আগুন বুকে জ্বেলে রেখে তবু সে ছুটছে আর ভাঙছে।
> সহস্র দেয়ালের নিচে মাথা কুটে কুটে বলছে। মুক্তি দাও।
> আমাকে মুক্তি দাও।[৭৬]

কয়েকটি সংলাপ অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎব্যাপ্ত বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অচরিতার্থতাজনিত জীবনাচরণের কাহিনীরূপ। কথোপকথনরীতিতে একুশের চেতনাকে লেখক কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থাপন করেছেন। ১৯৪৭- এর দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের নববিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে প্রত্যাশা আর স্বপ্নের বীজ বুনেছিল তা চূর্ণ হয় পাকিস্তানী শাসকদের হীন চক্রান্তের কারণে। একুশের মর্মকোষ উৎসারিত চেতনাকে বুকে ধারণ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার যে পুনর্জাগরণ ঘটে আপোষকামী প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীচরিত্রের কারণে এক পর্যায়ে তা স্তিমিত হয়ে

পড়ে। জাতীয় জীবনের এই সংকটময় মুহূর্তে 'অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতে একুশকে লেখক ত্রিমাত্রিক তীক্ষ্ণমুখ দৃষ্টিকোণে অবলোকন করেছেন; অতীত ছিল জাগরণ উন্মাতাল, মুক্তিপ্রয়াসী, সংগ্রাম শপথে প্রদীপ্ত; বর্তমান আত্মসমর্পণ, প্রতিক্রিয়া, বিকৃতি বিকারের হীনতা আক্রান্ত কিন্তু ভবিষ্যৎ চিরঞ্জীব মুক্তি চেতনায় উজ্জ্বল'[৭৭] -

আগুন জ্বালো।
আবার আগুন জ্বালো।
পুরো দেশটায় আগুন জ্বালিয়ে দাও।
সাত কোটি লোক আছে।
তার মধ্যে না হয় তিন কোটি মারা যাবে।
বাকি চার কোটি সুখে থাকুক। শান্তিতে থাকুক।
পুরো বছরটাকে শহীদ দিবস পালন করুক ওরা।[৭৮]

ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক জহির রায়হানের উৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা শিল্পসার্থক গল্প *একুশে ফেব্রুয়ারী*। ভাষা আন্দোলনের বিস্তৃত ক্যানভাসে শিল্পিত হয়েছে সামগ্রিক সমাজজীবন এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বময় বিপর্যস্ত যুগমানস। গল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সমাজের চারটি অংশের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রেণীচরিত্রের আলোকে ঘটনাক্রমে যারা বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী দিনটিতে এসে এমন একটি জায়গায় মিলিত হয়েছেন যেখানে ছাত্রদের মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক — গল্পে এই চারটি শ্রেণীর প্রতিনিধি চরিত্র যথাক্রমে মকবুল সাহেব, আনোয়ার হোসেন, রিক্সাচালক সেলিম এবং গ্রামের যুবক গফুর। গল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রধান চরিত্র তসলিম ভাষা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি।

গাঁয়ের ছেলে গফুরের চাষবাস করে জীবন কাটে। লেখাপড়া না জানলেও দরাজ গলায় গান গাইতে পারে। সারাদিনের কঠোর শ্রমের পর গভীর ঘুমে যখন গ্রামটা নিস্তব্ধ হয়ে যায় গফুর তখন মাটির প্রদীপ জ্বেলে ছয়ফুলমুলুক, সোনাভানের পুঁথি পড়ে সুর করে। জটিলতাবিহীন সহজ সরল এই জীবনে খুব বেশি কিছু চাওয়া নেই গফুরের-

খুব ছোট ছোট স্বপ্ন দেখতো।

একটি ছোট্ট ক্ষেত।
একটি ছোট্ট কুঁড়ে।
আর একটা ছোট্ট বউ।[৭৯]

নিজেরই গাঁয়ের মেয়ে আমেনাকে বিয়ে করে তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে চেয়েছে। সঞ্চিত অর্থ নিয়ে তাই আমেনার জন্য বিয়ের বাজার করতে শহরে আসে গফুর।
বার বছর ধরে শহরের রাস্তায় রিক্সা চালায় সেলিম। একমাত্র ছেলে আর বউ নিয়ে অভাব-অনটন আর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবন কাটে। দেশ বা

চারপাশের জগৎ সম্পর্কে উদাসীন সেলিমের একটাই চিন্তা- কেমন করে নিজের অবস্থার উত্তরণ ঘটানো যায়।

> দেশ কি সে জানেনা।
> সভা সমিতি মিছিলে লোকগুলো কেন এতো মাতামাতি করে তার অর্থ সে বুঝেনা।
> পুলিশেরা যখন ছাত্রদের ধরে ধরে পেটায় তখন সে অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। কোন মন্তব্য করেনা। তার ভাবনা একটাই।
> একটা রিক্সা কিনতে হবে।
> আরো একটা ভাবনা আছে তার। মাঝে মাঝে ভাবে।
> ছেলেটা আর একটু বড় হলে তাকেও রিক্সা চালানো শেখাতে হবে।[৮০]

আনোয়ার সাহেব এককালে ভালো কবিতা লিখতেন। এখন সামান্য বেতনের একজন সরকারী কর্মচারী। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মাঝে ফেলে আসা অতীত দিনগুলো নিভৃতচারী কেরানীর মনে সুখের দোলা দিয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন আনোয়ার হোসেনের জীবনে অনেক দুঃখ।

> ঘরে শান্তি নেই। স্ত্রীর দুঃখ।
> বাসায় প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র নেই। থাকার দুঃখ।
> সংসার চালানোর মত অর্থ কিংবা রোজগার নেই।
> বাঁচার দুঃখ।
> কবিতা লিখতে বসে দেখেন ভাব নেই। আবেগের দুঃখ।[৮১]

অন্যদিকে বিত্তশালী মকবুল সাহেবের জীবনে অভাব বলতে কিছুই নেই। নানা ধরনের ব্যবসা তার। ব্যাংক ব্যালেন্স, গাড়ি-বাড়ি সবকিছুই আছে। প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্যে ভরপুর মকবুল সাহেবের জীবন। পাকিস্তানী মতাদর্শে বিশ্বাসী মকবুল সাহেবের ব্যস্ত সময় কাটে মন্ত্রী-আমলাদের সাথে সভা-সমিতি করে। ব্যক্তিজীবনে সফল মকবুল সাহেবের জীবনেও দুঃখ আছে, তবে সে দুঃখের রকম ভিন্ন-

> দুটো পাটকল বসাবার বাসনা ছিল। একটার কাজও এখনো শেষ হলোনা। শ্রমের দুঃখ।
>
> বড় ছেলেটাকে বাচ্চা বয়সেই বিলেতে পাঠিয়ে ভালো শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছে ছিলো, স্ত্রী তার সন্তানকে কাছছাড়া করতে রাজি হলো না। জাগতিক দুঃখ। তেলের কলের শ্রমিকগুলো শুধু বেতন বাড়াবার জন্যে সারাক্ষণ চিৎকার করে, আর হরতালের হুমকি দেয়, দুঃখ। উৎপাদনের দুঃখ।
>
> কিছু ছেলে ছোকরা এবং গুণ্ডা জাতীয় লোক পথে ঘাটে মাঠে-ময়দানে মিছিল বের করে। সভা বসিয়ে সরকারের সমালোচনা করে। যাদের টাকা আছে তাদের সব টাকা গরীবদের বিলিয়ে দিতে বলে। দুঃখ।দেশের দুঃখ।[৮২]

ভাষা আন্দোলনে শহীদ তসলিমের বাবা আহমেদ হোসেন পুলিশের চাকরি করে। অত্যন্ত সচ্চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও নিষ্ঠাবান আহমেদ হোসেনের প্রমোশন আটকে আছে ছেলে তসলিমের রাজনৈতিক জীবনাচরণের জন্য। তসলিম ছাত্র-রাজনীতি করে। ভাষার জন্য, দেশমাতৃকার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে সে। কোন বাধাই তসলিমকে তার বিশ্বাস ও লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি-

> নিষ্ঠুর হৃদয় তসলিম বাবার প্রমোশন, মায়ের কান্না, আত্মীয়দের অনুরোধ, সংসারের প্রয়োজন সবকিছুকে উপেক্ষা করে মিছিলের মানুষ মিছিলেই রয়ে গেলো।[৮৩]

কৃষক গফুর, রিক্সাচালক সেলিম, কবি আনোয়ার হোসেন, প্রতিক্রিয়াশীল বিত্তশালী আমলা মকবুল সাহেব, পুলিশ অফিসার আহমেদ হোসেন, ছাত্রনেতা তসলিম প্রমুখ চরিত্রগুলোকে লেখক একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সামাজিক প্রতিবেশে চিত্রাত্মক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন এবং লেখকের শিল্পকুশলতায় প্রতিটি চরিত্রই বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে।

জহির রায়হান *একুশে ফেব্রুয়ারী* গল্পটি লেখার আগে ১৯৬৫ সালে বিষয়টিকে চলচ্চিত্ররূপ দিতে চেয়েছিলেন এবং সে অনুযায়ী *চিত্রনাট্য লিখে* এফ.ডি.সিতে জমাও দিয়েছিলেন। এমনকি ছবির জন্য চরিত্রপাত্রও নির্বাচন করেছিলেন। সামরিক শাসন এবং পেশাগত কারণে শেষপর্যন্ত তাঁর সে ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়নি। এর পাঁচবছর পর মাসিক *সমীপেষু*'তে *একুশে ফেব্রুয়ারী*'র চিত্রকাহিনী প্রকাশিত হয়। *একুশে ফেব্রুয়ারী*'র কাহিনী রাজনীতিনির্ভর এবং এর চরিত্রগুলো আধুনিক জীবনলক্ষণাক্রান্ত। কাহিনীর শুরুতে গফুর এবং সেলিম চরিত্রটিকে কৌতূহলী বহিরাগত মনে হলেও লেখকের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কারণে তাদের পরিণতি শেষপর্যন্ত ছাত্র-আন্দোলনে একটি ভিন্নমাত্রা সংযোজন করে।

রাজনৈতিক গল্প হওয়া সত্ত্বেও *একুশে ফেব্রুয়ারী* শেষ পর্যন্ত তত্ত্বগন্ধি বা শ্লোগানাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি লেখকের মানবিক মূল্যবোধ সঞ্জাত জীবনচেতনার কারণে।[৮৪]

চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান *একুশে ফেব্রুয়ারী*'র শরীর নির্মাণে চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। আর পরিচ্ছেদ বিভাজনে ফেড ইন ও ফেড আউট এবং ঘটনার উপস্থাপনায় কাট-টু-কাট পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।[৮৫] গল্পে লেখক ছোট ছোট বাক্যে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন-

> কতগুলো মুখ।
> মিছিলের মুখ।
> রোদে পোড়া।
> ঘামে ভেজা।
> শপথের কঠিন উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর।
> এগিয়ে আসছে সামনে।[৮৬]

এই চিত্রাত্মক বর্ণনারীতির মধ্যে লেখকের অন্তর্গত রক্তিম আবেগ কাব্যিক ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে-

> ধলপহরের আগে রাস্তায় নেমে এলো একজোড়া খালি পা।
> সুতোর মত সরু পানি ঝরণা হয়ে বয়ে যাচ্ছে এখন।
> কয়েকটি খালি পা কংক্রিটের পথ ধরে এগিয়ে আসছে সামনে।
> ঝরণা এখন নদী হয়ে ছুটে চলেছে সাগরের দিকে।
> সামনে বিশাল সমুদ্র।
> সমুদ্রের মতো জনতা।
> নগ্ন পায়ে এগিয়ে চলছে শহীদ মিনারের দিকে।
> অসংখ্য কালো পতাকা।
> শত শত করে উড়ছে।
> উড়ছে আকাশে।
> মানুষগুলো সমুদ্রের ডেউয়ের মতো অসংখ্য ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে সামনে।
> ইউক্যালিপ্টাসের পাতা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে নিচে। মাটিতে ঝরে।
> প্রতিবছর ঝরে।
> তবু ফুরোয়না।[৮৭]

জহির রায়হানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প *কয়েকটি মৃত্যু* আকৃতিগত দিক দিয়ে বৃহদায়তন হলেও মূলত *একুশে ফেব্রুয়ারী* মতই একটি বড় গল্প। একটি স্বপ্নকে কেন্দ্র করে *কয়েকটি মৃত্যু'র* কাহিনী এবং চরিত্রগুলো বিকশিত হয়েছে। স্বার্থপরতা, বাৎসল্যরস আর জীবনের প্রতি আসক্তি ইত্যাদির আলোকে লেখক মানবমনের অন্তর্গত রহস্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে।

একটি বিশাল পরিবারের প্রধান কর্তা বৃদ্ধ আহমদ আলী শেখ এবং তার পরিবারের সদস্যদের মনোজাগতিক চিন্তা-চেতনার মধ্যে গল্পের কাহিনী সীমাবদ্ধ। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর বৃদ্ধ আহমদ আলী শেখ সম্পত্তি বিনিময় করে নতুন শহরে এসে বসতি স্থাপন করেন। বড় তিন ছেলে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। ছেলে আর ছেলেবউরা সবাই মিলেমিশে একসাথে বাস করে। ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী নিয়ে রিটায়ার্ড মকবুল সাহেবের ভরা সংসার। কৃষকের কাছে তার ফসলের ক্ষেত যেমন প্রিয় আহমদ আলীর কাছে তার পরিবারও তেমনি-

> মাঝে মাঝে ছেলে, ছেলের বউ আর নাতি-নাতনীদের সবাইকে একঘরে ডেকে এনে বসান আহমদ আলী শেখ। তারপর চেয়ে চেয়ে তাদের দেখেন। একজন চাষী যেমন করে তার ফসলভরা ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকেন তেমনি সবার দিকে তাকিয়ে দেখেন আহমদ আলী শেখ।[৮৮]

আপাতদৃষ্টিতে হাসি-খুশি-আনন্দময় পারিবারিক জীবনে অকস্মাৎ বিষাদের ছায়া নেমে আসে একটি স্বপ্নকে কেন্দ্র করে। এক রাতে বুড়ো আহমদ আলী

সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে আবৃত চারটি মূর্তিকে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠেন। দীর্ঘ বাইশ বছর আগে একই স্বপ্ন দেখেছিল আহমদ আলীর পিতা, আর তার পরদিন কলেরা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় পিতা এবং মেজ ভাই। বাইশ বছর পরে সেই একই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তির মাঝে পরিবারের সকলে ভবিষ্যতের অশনি সংকেত দেখতে পায়। আসন্ন বিপদের চিন্তায় উদ্বেগাকুল পরিবারের সদস্যদের জটিল অন্তর্জগৎ উন্মোচিত হয়েছে লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে। জাগতিক সুখে বিভোর বৃদ্ধ আহমদ আলী শেখের মনে এতোদিনে পরকালের চিন্তা জেগেছে-

> মনে মনে আজরাইলের কথা ভাবলেন বুড়োকর্তা।
> পরলোকের কথা ভাবলেন।
> হাশরের ময়দানের কথা ভাবলেন।
> বেহেস্ত আর দোজখের কথা ভাবলেন।[৮৯]

আহমদ আলীর বড় ছেলে মনসুর ওকালতি করেন। স্ত্রী ছেলেমেয়ে আর পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মিথ্যের বেসাতি করেছেন সারাজীবন। অর্থের বিনিময়ে যুক্তিতর্কের জাল বুনে নিরাপরাধকে শাস্তি দিয়েছেন আর অপরাধীকে বেকসুর খালাস করে নিয়ে এসেছেন। পিতার মতো তার মাঝেও আজ পরকালের চিন্তা এসেছে। মনসুর যখন তার ইহকালের হিসেব কষতে ব্যস্ত তখন তার স্ত্রী ভাবছে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে। বড় বউদের মতো মেজ বউও ভাবছে সম্পত্তির অংশীদার আর স্বামীর ইনসিওরেন্সের টাকা নিয়ে। মেঝ ছেলে আহসান স্ত্রীর এই স্বার্থপরতায় যারপরনাই বিস্মিত -

> আশ্চর্য। আমি মরে গেলে আমার মৃত্যুটা তার কাছে বড় নয়। বড় হলো ... কেমন করে সে খাবে। পরবে। বাঁচবে।
>
> --- মনে মনে ভাবলো আহসান, আমি যখন একেবারে ছোট ছিলাম তখন মা দিনরাত সেবা শুশ্রূষা করে আমাকে মানুষ করেছে। নিজে না খেয়ে আমাকে খাইয়েছেন। আর আমি যখন আরেকটু বড় হলাম তখন আমার বাবা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির রোজগার ব্যয় করে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। আরও পরে আমি যখন রোজগার করতে শুরু করলাম তখন আমাকে বিয়ে করিয়ে ঘরে বউ এনেছে।
>
> 'বউ' পরের মেয়ে।
> ধীরে ধীরে বাবা মা'র চেয়ে পরের মেয়েটা আমার আয়ো আপনার হয়ে দাঁড়ালো। তার দুঃখে আমি কাঁদি। তার আনন্দে আমি হাসি। আর সে মেয়েটিই কিনা আজ এত স্বার্থপরের মতো চিন্তা করতে পারলো।[৯০]

বড় দুই বউ যখন ভাবছে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে সেজ ছেলে মকবুলের স্ত্রী তখন ভাবছে স্বামীর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে; তার মৃত্যুর পর স্বামী আবার বিয়ে করবে কিনা। স্ত্রীর এই অমূলক চিন্তা পাটের ব্যবসায়ী মকবুলকে বিরক্ত করে। মৃত্যুভয়ে ভীত মকবুল স্ত্রী সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে স্ত্রীকে অবগত করে রাখে। আর আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিষণ্ন হয়ে ওঠে মকবুল-

> অদূরে শুয়ে থাকা ছেলের দিকে তাকালো মকবুল। উঠে এসে ওর গায়ে মাথায় কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে আদর করলো সে। মনে হলো যেন নিজেকে অনুভব করলো। আমার সন্তান। ওর সারা দেহে আমার রক্ত ছড়িয়ে। [৯১]

অনিশ্চিত এই মৃত্যুভীতির মাঝেও বুড়ো আহমদ আলী এবং আজন্ম রোগগ্রস্ত ছোট ছেলে শামছুর কাল্পনিক মৃত্যুসম্ভাবনাকে আবিষ্কার করে পুত্র এবং পুত্রবধূরা নিজেদের কিছুটা নিরাপদ মনে করে। দ্বিতীয়বার বুড়ো কর্তা স্বপ্নে দেখলেন ছায়ামূর্তিরূপে আজরাইল তার যে কোন দুটো ছেলের জান কবজ করতে এসেছে। পিতার চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠল প্রিয় সন্তানদের মুখ। পিতৃস্নেহে অন্ধ পিতা ছায়ামূর্তিকে বললেন-

> ... তুমি আমার দুটি ছেলেকে না মেরে তাদের তিন তিনটে বউ আছে আমার ঘরে। তাদের তিনটে বউকে মেরে ফেলো। বউ মারা গেলে বউ পাওয়া যাবে কিন্তু ছেলে মারা গেলে ওদের তো আমি আর ফিরে পাবোনা।[৯২]

বুড়ো আহমদ আলীর এই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়ে পিতৃহৃদয়ের বাৎসল্য রূপটিই প্রকাশিত হয়েছে। আর কর্তা গিন্নী জোহরা খাতুনের মধ্য দিয়ে চিরন্তন নারী হৃদয়ের শাশ্বত স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছে-

> ইয়া আল্লাহ, কাউকে যদি মরতে হয় তাহলে সবার আগে আমাকে মারো। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ইয়া আল্লাহ আমি বেঁচে থাকতে আমার কোনো ছেলেমেয়ের গায়ে হাত দিয়ো না। আমার স্বামীর গায়ে হাত দিয়ো না। ইয়া আল্লাহ আমি যেন সবার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি।[৯৩]

এমনিতর মানসিক পরিস্থিতিতে গৃহভৃত্য আবদুলের আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর মাঝে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিপদমুক্তির পথ আবিষ্কার করে পরিবারের সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু সবার উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে আব্দুলের স্ত্রী জমজ বাচ্চার জন্ম দেয়। এই সঙ্গেই গল্পটির শেষ হয়েছে।

পরিবার প্রধানের স্বপ্নকে কেন্দ্র করে পুত্র এবং পুত্রবধুদের অন্তর্জগতের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই *কয়েকটি মৃত্যু*'র কেন্দ্রীয় বিষয়। মানবচরিত্রের অন্তর্গত রহস্য উন্মোচনে লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি *কয়েকটি মৃত্যু*'কে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

আঙ্গিকগত বিচারে *কয়েকটি মৃত্যু* বড় গল্প। মানব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও ঘটনাকাল নির্ণয়ে '১৯৬৭' নির্দিষ্ট সময়কালের উল্লেখ লেখকের সময়-সচেতনতার পরিচয়বাহী। ক্ষুদ্র পরিসরে লেখক সে সময়ের বিশ্বব্যাপ্ত বিপর্যস্ত সমাজ-বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন বৃদ্ধ আহমদ আলীর খবরের কাগজ পড়ার মধ্য দিয়ে-

> দল গড়ছে। দল ভাঙছে। দফার পর দফা সৃষ্টি করছে। আর বক্তৃতা দিচ্ছে। ভিয়েতনামে ত্রিশজন মরলো। রোজ মরছে। তবু শেষ হয়না। আইয়ুব খানের ভাষণ। আর কাশ্মির। কাশ্মির, কাশ্মির।[৯৪]

চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের চিত্রাঙ্কনের বিপরীতে আহমদ আলী শেখের স্কুল-পড়ুয়া নাতীর পাঠ্য অন্তর্গত বিষয় নির্ধারণ লেখকের পরিকল্পিত ভাবনার ইঙ্গিতবাহী-

> আল্লাহতায়ালা বলিলেন, ইহাদের সেজদা করো। ইবলিশ বলিলো, হে সর্বশক্তিমান, আপনি যে মানুষ পয়দা করিয়াছেন ইহারা সমস্ত দুনিয়াকে জাহান্নামে পরিণত করিবে। ইহারা পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিবে। কলহ করিবে। মারামারি করিবে।[৯৫]

তর্থনির্দেশ ও টীকা

১। বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের ছোটগল্প, 'সাহিত্য পত্রিকা' (সম্পাদকঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ছত্রিশ বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯৯, পৃ. ১৯২।
২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭।
৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫।
৪। ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী (স.), *জহির রায়হান রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৮৭, আহমদ পাবলিশিং হাউস।
৫। এ.এক.এম. খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৬, পৃ. ৪৫।
৬। *হারানো বলয়*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড (সম্পাদক : ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী) প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৮৭, আহমদ পাবলিশিং হাউস, পৃ:৯৪
৭। *হারানো বলয়*, জহির রায়হান রচনাবলী, ২য় খণ্ড,পূর্বোক্ত, পৃ.৯৫।
৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫
৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
১২। *সূর্যগ্রহণ*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।
১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬
১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭
১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫
১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬
১৭। এ.কে.এম. খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।
১৮। *সূর্য গ্রহণ*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।
১৯। *ভাঙাচোরা*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।
২০। *ভাঙাচোরা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১।
২১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭
২২। *বাঁধ*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮
২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।
২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।
২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।
২৬। *নয়াপত্তন*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮
২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।
২৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।
২৯। *অপরাধ*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩
৩০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩।

৩১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।
৩২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।
৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।
৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬-২৭।
৩৫। *ম্যাসাকার*, জহির রায়হান রচনাবলী,২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩।
৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫।
৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।
৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।
৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭।
৪০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬।
৪১। এ. কে. এম. খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৬, পৃ. ৫১-৫২।
৪২। *অতি-পরিচিত*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।
৪৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।
৪৪। এ.কে.এম. খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।
৪৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।
৪৬। *ইচ্ছা-অনিচ্ছা*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।
৪৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯-৪০।
৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২।
৪৯। এ. কে. এম. খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।
৫০। *ইচ্ছা-অনিচ্ছা*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২।
৫১। এ. কে. এম. খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।
৫২। *ইচ্ছা-অনিচ্ছা*, জহির রায়হান রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১।
৫৩। এ.কে.এম.খায়রুল আলম,*জহির রায়হানের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।
৫৪। *স্বীকৃতি, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০।
৫৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।
৫৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।
৫৭। *জন্মান্তর*, জহির রায়হান রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
৫৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩-৪৪।
৫৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭-৪৮।
৬০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।
৬১। এ. কে. এম. খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।
৬২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।
৬৩। *পোস্টার, জহির রায়হান রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।
৬৪। *দেমাক*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭।
৬৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮।
৬৬। *মহামৃত্যু*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।
৬৭। এ.কে.এম. খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

৬৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।
৬৯। *একুশের গল্প*, জহির রায়হান রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪।
৭০। এ.কে.এম খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৯
৭১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।
৭২। *মহামৃত্যু*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।
৭৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।
৭৪। *একুশের গল্প*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫-২০৬।
৭৫। এ.কে.এম. খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।
৭৬। *ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬-৫৭।
৭৭। এ.কে.এম. খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।
৭৮। *কয়েকটি সংলাপ*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।
৭৯। *একুশে ফেব্রুয়ারী*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৫।
৮০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮।
৮১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭।
৮২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭-৬৮।
৮৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।
৮৪। শাহরিয়ার কবির, *একুশে ফেব্রুয়ারী, জহির রায়হান, প্রথম প্রকাশ,* জানুয়ারি ১৯৯৮, অনুপম প্রকাশনী, পৃ. ১৬।
৮৫। এ.কে.এম. খায়রুল আলম, *জহির রায়হানের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।
৮৬। *একুশে ফেব্রুয়ারী*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৪।
৮৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬।
৮৮। *কয়েকটি মৃত্যু*, জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।
৮৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।
৯০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।
৯১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।
৯২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯।
৯৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯।
৯৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১-৭২।
৯৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

উপসংহার

উপসংহার

স্বকাল ও সমাজের সতর্কদ্রষ্টা জহির রায়হান বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নির্মাণ করেছেন একটি স্বতন্ত্র প্রতিবাদী ধারা। ষাটের দশকের অবরুদ্ধ, কল্লোলিত সময়কে বাংলাদেশের যে ক'জন কথাসাহিত্যিক শিল্পিত ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন, জহির রায়হান তাদের অন্যতম।

পাকিস্তানী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জহির রায়হানের লেখনী এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি নব্য উপনিবেশবাদ-বিরোধী সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও জহির রায়হান নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। যে কারণে বায়ান্ন থেকে একাত্তরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আমরা তাকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখতে পাই। জহির রায়হানের সাহিত্য-সাধনার শিকড় প্রোথিত ছিল ভাষা-আন্দোলনের মর্মমূলে। একুশের মর্মকোষ উৎসারিত চেতনাকে ধারণ করে একাধিক গল্প-উপন্যাস তিনি লিখেছেন। মার্ক্সীয় দর্শনে আস্থাশীল জহির রায়হান মানুষের সংঘ-জীবনচেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। রোমান্টিকতা এবং আবেগতাড়িত না হয়ে বিশ্বব্যাপী বঞ্চিত শোষিত, সর্বহারা মানুষের সপক্ষে সমাজ-পরিবর্তনে তিনি আমৃত্যু বিশ্বাসী ছিলেন। পাকিস্তানী সামরিক শাসনের ভয়ে সমকালীন অনেক কথাসাহিত্যিক যেখানে জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে আপোষকামী ছিলেন সেখানে জহির রায়হান ছিলেন নির্ভীক, সাহসী, দায়িত্ববান কথাশিল্পী। বৈরী প্রতিকূল পরিবেশে বাস করেও সমকালীন সমাজ-বাস্তবতাকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। সামসময়িক অনেক কথাসাহিত্যিকদের মত পলায়নমুখর ও বিবরকামী হয়ে প্রতিক্রিয়া কিংবা আত্মরতির উদ্বোধনে তিনি তাঁর মেধা ও শক্তির অপচয় করেন নি। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ, গণতান্ত্রিক বিপর্যয়, সামাজিক নৈরাজ্য, জাতিশোষণ, শ্রেণীশোষণ, ধর্মশোষণ, সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীর পেশীশক্তি, সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বিশ্বব্যাপী যে ধ্বংস আর অরাজকতায় সৃষ্টি করেছে জহির রায়হানের সতর্ক ও পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে। এই বৈশ্বিক মানবিকতাবোধ জহির রায়হানকে বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসন দান করেছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন জহির রায়হানের কথাসাহিত্যের মৌল উপকরণ। অত্যন্ত নির্মোহ ও অনাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, চাওয়া-পাওয়ার অচরিতার্থতাজনিত বেদনায় শিল্পিত রূপ অঙ্কিত করেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে মধ্যবিত্ত-মানসের বহির্জাগতিক ও অন্তর্জাগতিক টানাপোড়েনের দ্বান্দ্বিক চিত্রটি ধরা পড়েছে।

শিল্প-সাহিত্য সমাজসত্যের প্রতিনিধিসত্তা। আর মানুষ যেহেতু সমাজের প্রাণসত্তা সেজন্যে মানুষের কথকতা নিয়েই সৃষ্টি হয় শিল্প-সাহিত্য। উপন্যাস বা কথাসাহিত্যে সমাজের পরিপূর্ণ রূপটি যতটা বিকশিত হয়ে ওঠে সাহিত্যের অন্য কোন মাধ্যমে ততটা নয়। একজন সমাজ-সচেতন কথাসাহিত্যিকের দায়িত্বই হচ্ছে তাঁর সমকালীন সমাজ-বাস্তবতাকে লেখনীর মাধ্যমে শিল্পিত করা। সে অর্থে জহির রায়হান একাধারে সমাজ-সচেতন অন্যদিকে রাজনীতি-

সচেতন। সমকালীন সমাজ-রাজনীতি তাঁর রচনার প্রধান উপজীব্যরূপে শিল্পিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকলেও জহির রায়হান তার উপন্যাস বা গল্পে কোন রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করেননি বা কোন সামাজিক সমস্যার সমাধানও নির্দেশ করেননি। যে কালের তিনি মানুষ কেবল সেই সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দেশ-বিভাগ পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলো তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমাজ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, রাজনীতি-অর্থনীতি কিভাবে শোষক ও শোষিতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করছে, নিপীড়িত পরাধীন মানবাত্মা কিভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে মুক্তির অন্বেষায়- এসবই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। নির্মোহ দৃষ্টিতে সেসবই তিনি শিল্পিত করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে এবং সৃষ্টি করেছেন একটি স্বতন্ত্রধারা — বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকে যা সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করেছে।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি

(ক) মূলগ্রন্থ

জহির রায়হান

শেষ বিকেলের মেয়ে, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান, ড. মোহাম্মদ হান্নান ও আরজুমন্দ আরা রানু সম্পাদিত, ১৯৯৮, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী

তৃষ্ণা, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান, পূর্বোক্ত

হাজার বছর ধরে, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান, পূর্বোক্ত

আরেক ফাল্গুন, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান, পূর্বোক্ত

বরফ গলা নদী, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান, পূর্বোক্ত

আর কত দিন, উপন্যাস সমগ্র জহির রায়হান, পূর্বোক্ত

জহির রায়হান রচনাবলী ২য় খণ্ড, ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ১৯৮১, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস

(খ) সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৪, ঢাকা, লেখক সংঘ প্রকাশনী

আলমগীর কবির

জহির : একটি চেতনা, জহির রায়হান (স্মরণিকা), ঢাকা

কামরুদ্দীন আহমদ	*পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ১৩৭৬ ঢাকা, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন
	বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ২য় খণ্ড, ১৩৮২, ঢাকা, ইনসাইড লাইব্রেরী
খোন্দকার সিরাজুল হক	*মুসলিম সাহিত্যসমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, ১৯৮৪, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ।
গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ (স.)	জহির রায়হান (স্মরণিকা) , ঢাকা
ড. আশরাফ সিদ্দিকী (স.)	*জহির রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, ১৯৮০, ঢাকা
	জহির রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৬, ঢাকা
ড. মযহারুল ইসলাম (স.)	*শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে*, ১৯৭৩, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
পান্না কায়সার	*মুক্তিযুদ্ধ আগে ও পরে*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী
বদরুদ্দীন উমর	*পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ১৯৭৫, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স
	পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৫, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স
বিশ্বজিৎ ঘোষ	*বাংলাদেশের সাহিত্য*, ১৯৯১, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
ভীষ্মদেব চৌধুরী	*তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, ১৯৯৮, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
ভূঁইয়া ইকবাল	*বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র*, ১৯৯১, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

মনসুর মুসা	*পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, ১৯৭৪, ঢাকা, পূর্বলেখ প্রকাশনী
মোহাম্মদ হান্নান	*বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাস* ১ম খণ্ড, ২য় বর্ধিত সংস্করণ, ১৯৮৬, ঢাকা
মুহম্মদ ইদরিস আলী	*বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, ১৩৯১, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
রফিকউল্লাহ খান	*বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, ১৯৯৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
শাহরিয়ার কবির (স.)	*একুশে ফেব্রুয়ারী, জহির রায়হান*, ১৯৯৮, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী ।
	একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, বইমেলা ২০০০, ঢাকা, সময় প্রকাশন
শিরীন আখতার	*বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, ১৯৯৩, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
সাইদ-উর রহমান	*পূর্ববাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং কবিতা*, ১৯৮৩, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সৈয়দ আকরম হোসেন	*প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, ১৯৯৭, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স
সারোয়ার জাহান	*জহির রায়হান*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
হাসান আজিজুল হক	*কথাসাহিত্যের কথকতা*, ১৯৮১, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
হাসান হাফিজুর রহমান (স.)	*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, ১৫শ খণ্ড, ১৯৮৩, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(গ) সহায়ক বাংলা প্রবন্ধ

অমলেশ ত্রিপাঠী	*স্বাধীন ভারত সমস্যা, সাফল্য, ব্যর্থতা, সম্ভাবনা*, দেশ ৫৮ বর্ষ ৪১ সংখ্যা (সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ), ১০ আগস্ট, ১৯৯১, কলকাতা
আফজালুল বাশার	*জহির রায়হান : তার সাহিত্য ও অপ্রকাশিত ডায়েরী*, উত্তরাধিকার, মাঘ-চৈত্র, ১৩৯৩
এ.কে.এম. খায়রুল আলম	*জহির রায়হানের গল্প*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৬
জাকারিয়া হাবিব	*মনে এলো*, দৈনিক বাংলা, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩
বিশ্বজিৎ ঘোষ	*বাংলাদেশের ছোটগল্প*, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ছত্রিশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), ফাল্গুন ১৩৯৯, ঢাকা
রফিকুল ইসলাম	*শহীদ মিনার, বাংলা একাডেমী ও বাংলাদেশ*, একুশের প্রবন্ধ' ৯৪, জুন ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা